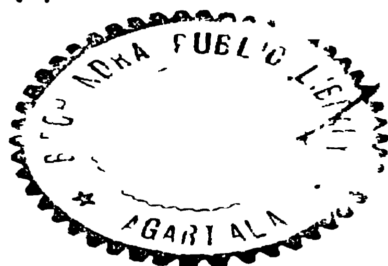
পূর্বরাগ

রমেশচন্দ্র সেন



ক্লাসিক প্রেস
কলিকাতা

: প্রথম সংস্করণ :
ফাল্গুন ১৩৬৩

: প্রকাশক :
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
৩।১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট্
কলিকাতা

: প্রচ্ছদ পট :
শ্রীগণেশ বসু

: মুদ্রক :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট্
কলিকাতা

দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

‘স্যাম্পু ভাই ও পাম্পু ভাইকে’

এই লেখকের—

অপরাজেয়

১

মাথায় টিকি ও কদম ছাঁটা চুল, গায়ে লম্বা জিনের কোট, পরনে সাদা থান। এ-হেন প্রকাশ মুখুজ্জের সঙ্গেই তার আবাল্য বন্ধুত্ব।

কিন্তু সেই প্রকাশের আজ এ কী পরিবর্তন! সে আজ ছোট বড় করে চুল ছেঁটেছে, অঙ্কুর সমেত দাড়ি কামিয়ে মুখে মেখেছে পাউডার, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পরেছে, পায়ে এ্যালবার্টের স্থান দখল করেছে একজোড়া নিউকাট সেলিম।

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, কি খবর প্রকাশ?

—গেলাম, দেখলাম···এবং তারপর একটু থেমে প্রকাশ বলল, পরাজিত হলাম।

—যুদ্ধটা হল কোথায়?

বুকের উপর হাত রেখে প্রকাশ বলল, এইখানে।

—বল কি হে, তুমি প্রেমে পড়েছ?

ব্যাপাবটা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সত্যই বিস্ময়কর। প্রকাশ তাঁদের কাছে অনেকবার বলেছে, সে আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে।

কেউ কখনও নারী জাতিব প্রতি তার কোন দুর্বলতা দেখেনি। বন্ধুরা তাই তার নাম দিয়েছে শুকদেব। আর আলাপ আলোচনায় কথা-বার্তায় বা ধরন-ধারণে প্রকাশ ছিল একান্তই সেকেলে।

সে বলল, অসম্ভবও অনেক সময় এরকম সম্ভব হয়ে ওঠে ভাই। এ ছিল আমার কপালের লিখন।

ক্ষিতীশ বলল, 'কন্‌গ্রাচুলেশনস্!'

প্রকাশ উত্তর করল, 'কন্‌গ্রাচুলেশনের' কোন কারণ নেই ভাই।

—কেন?

—কার প্রেমে যে পড়েছি তাই জানি না।

—তবে ? তবে কি স্বপ্ন দেখেছ ?

—তাও বলতে পার। সে যেন একটা স্বপ্ন রাজ্যের—

ক্ষিতীশ বলল, হেঁয়ালি ছেড়ে আসল ব্যাপারটা বল দেখি।

কালই সিনেমায় তাকে প্রথম দেখলাম। আমার ডান দিকে কয়েকখানা 'সিট' খালি ছিল। নিউজ রিল শেষ হওয়ার একটু আগে পাশে চুড়ির ঠুন ঠুন শব্দ হল। চারদিক ভরে গেল একটা সুন্দর সেণ্টের গন্ধে। গন্ধটা প্যারীর কোন হাই ক্লাশ এসেন্স কিম্বা বুলগেরিয়ার আতরের হবে। তবে ও বিষয়ে আমি এক্সপার্ট নই, জান ত ?

—তারপর কি হল ?

আলো জ্বলে উঠলে দেখলাম আমার পাশে বসে আছে একটি অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী। তার রূপে হলের আলোগুলো সব ম্লান হয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ বলল, প্রেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবিত্ব।

প্রকাশ বলল, কবিত্ব নয় ভাই 'ট্রুথ'। সুন্দরী অনেক দেখেছি কিন্তু তাদের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। এ যেন উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী সকলের রূপ নিয়ে···

বাধা দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, শেষের নাম দু'টো আর ক'রনা ভাই, তোমার ঐ রম্ভা আর কি যেন ঘি ?

—ঘি নয় ঘৃতাচী। স্বর্গের অপ্সরা।

ঐ কটমটে নামটা শুনলেই সব রস উবে যায়। কাব্যরস প্রেমরস। যাক সংক্ষেপে বুঝলাম বায়স্কোপে একটি সুন্দরীকে দেখে তুমি প্রেম সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছ।

—'রাইট ও'। ঠিক ধরেছ, বলে প্রকাশ বন্ধুর পিঠে সোৎসাহে দু' দু'টো চড় বসিয়ে দিল।

—এ কি দুর্ভোগ, তোমার প্রেমের পেনালটি দিতে হবে আমায়

তোমার ঐ মোটা কাঠখোট্টা হাতের চড়ে আমি যে চোখে সরষে ফুল দেখছি।

'একস্‌কিউজ্‌ মি প্লিজ্‌'। এসেছি পরামর্শের জন্য। শুধু পরামর্শ নয়। সাহায্যও চাই।

—কি সাহায্য আমি করতে পারি?

—আমি তাদের মোটরের নম্বর টুকে নিয়েছি। এখন তোমাতে আমাতে গিয়ে খোঁজ করতে হবে।

—তোমার উর্বশী তাহলে বড় লোকের মেয়ে। নম্বরটা টুকলে কখন?

—নিয়েছি সিনেমা ভাঙার একটু পরে।

—কাজ তাহলে অনেক সহজ করে এনেছ। পুলিশেরা ঐ নম্বরের সূত্রেই চোর ডাকাত ও খুনী আসামীকে পর্যন্ত খুঁজে বার করে।

প্রকাশ বলল, তাদের সঙ্গে তুলনা করছ একটি ইয়ং বিউটির!

—তুলনা ঠিক নয়, তবে তাকেও এক রকমের ডাকাত বলা চলে।

খুশী হয়ে প্রকাশ ক্ষিতীশের হাতে একটুকরো কাগজ দিল।

ক্ষিতীশ বলল, আজ আমার কাজ আছে। এর মধ্যেই মোটর গাইড্‌ নিয়ে গাড়ীর মালিকের নাম ঠিকানাও জেনে নিয়েছ দেখছি। আচ্ছা, তুমি ভোল বদলালে কেন বল দেখি?

প্রকাশ বলল, কেন ভাল করিনি কি? তোমরা অনেক বারই আমায় বলেছ পোশাক পরিচ্ছদে অন্তত একটু আপ-টু-ডেট্‌ হতে।

—তা, টিকিটার কি করলে?

—টিকির মায়া অবশ্য ছাড়তে পারিনি কিন্তু সেটাও ছেঁটে ছোট করে দিয়েছি। হঠাৎ ধরবার জো নেই।

—আমি কিন্তু এ অবস্থায় পড়লে মেয়েটিকে জয় করবার চেষ্টা করতাম টিকি ও জিনের কোটের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে। একালে ওগুলো অচল বলেই মডার্ন উর্বশীর দৃষ্টি বেশী করে পড়ত।

—পোশাক বদলান দরকার মনে হল ভাই। তুমি যদি দেখতে সিনেমায় মেয়েটির সেই চাহনি! আমার পোশাক পরিচ্ছদ আর টিকি দেখে মেয়েটি বোধ হয় মনে করেছিল আমি একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ।

ক্ষিতীশ বলল, কিন্তু ঐটেই হত জয়ের সোজা রাস্তা। একেবারে হাইওয়ে।

তাদের কথাবার্তা চলল আরও কিছুক্ষণ। প্রকাশ উঠল বেলা এগারটায়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে গলা ছেড়ে দিল, "তুমি যে সুরের আগুণ ছড়িয়ে দিলে মোর প্রাণে।"

২

নিউ আলিপুরের একটি ছোট রাস্তা। বাড়ি উঠেছে মাত্র কয়েকখানা। তার মধ্যে ব্লক ও, প্লট নং ৫৩৬ খুঁজে নিতে কোন অসুবিধাই হল না। নম্বর প্লেটখানা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ বাড়িটার ছাদ থেকে নীচে পর্যন্ত বার দুই দেখে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল, 'হিয়ার ইট্ ইজ'।

ক্ষিতীশ বলল, এত জোর গলায় নয়, ধীরে বন্ধু, ধীরে।

প্রকাশ বলল, এই বাড়ির ছাদে সে বেড়ায়, জানলায় দাঁড়ায়।

ক্ষিতীশ পাদপূরণ করে দিল, কলঘরে, স্নান করে, ডাইনিং-রুমে খায়।

ঐ বাড়ির নীচের গ্যারেজ থেকে এক গালপাট্টাওয়ালা তাদের লক্ষ্য করছিল। প্রকাশদের হাব ভাব দেখে তার মনে হল ব্যাপার সুবিধার নয়।

বাবুরা যে গ্যারেজের দিকেই এগিয়ে আসছে। তবে কি···? তাদের যেন লক্ষ্যই করেনি এই ভাবে সে গাড়ির ইঞ্জিন পরিষ্কার করতে লাগল। গ্যারেজের আরও একটু কাছে এসে প্রকাশ চীৎকার করে উঠল, গাড়ির নম্বর মিলেছে ক্ষিতীশ।

কথাটা গালপাট্টাওয়ালার কানে গেল। তার একবার মনে হল ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই দেখল সে চেষ্টায় সুবিধা হবে না।

গ্যারেজের সামনে এসে প্রকাশ বলল, রাম রাম ভেইয়া।

গালপাট্টাওয়ালা বলল, জী রাম রাম।

প্রকাশ বলল, আপ্ ইয়ে গাড়ীকা ড্রাইভার হ্যায়?

—ড্রাইভার নেহী, মোটর-ইঞ্জিনীয়ার হুঁ।

—ড্রাইভার কাঁহা গয়া?

—ম্যায় নেহী জানতা হুঁ। কোঠিকা ফটকমে যা কর পুঁছিয়ে।

প্রকাশ ক্ষিতীশকে বলল, লোকটা দমবাজী করছে। রবিবার একেই গাড়ি চালাতে দেখেছি। তারপর গালপাট্টাওয়ালার উদ্দেশে বলল, সচ্ বাতাও, কুচ বক্‌শিস্ করেগা।

বকশিস্ শুনে লোকটার চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, আপ্ লোক বিরিঞ্চি পর বৈঠিয়ে।

বন্ধুদ্বয় গ্যারেজের ভিতরে ছোট বেঞ্চিটায় বসল।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, এতোয়ার কী রাতমে আপ্ সিনেমা গয়ে থে?

ড্রাইভার—গয়ে হোঁগে। মুঝে মালুম নেহী, ম্যায় ইঞ্জিনীয়ার হুঁ, খিদিরপুর ইঞ্জিনিয়ারীং ভ:স্।

প্রকাশ দশটাকার একটা নোট নাড়তে নাড়তে বলল, দেখিয়ে ইঞ্জিনীয়ার সাব, কুছ খবর মাংতা।

লোকটির সুর এবার নরম হল। সে বলল, ফরমাইয়ে।

ক্ষিতীশ বলল, এতোয়ার কো আপ্ শ্যামবাজার বায়স্কোপ··

গালপাট্টাওয়ালা বলল, স্যায়দ ড্রাইভার গয়ে থে।

ক্ষিতীশ জিজ্ঞাসা করল, গাড়ীমে ঔর কৌন্ কৌন্ থা।

প্রকাশ বলল, একঠো বুঢ্ঢা বাবু, একঠো মায়ী ঔর—

ক্ষিতীশ পাদপূরণ করে বলল, ঔর খুপ্‌সুরৎ লড়কী।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ যোগ করল, বহুৎ বহুৎ খুপসুরৎ। একদম অপ্সরাকে মাফিক।

গালপাট্টাওয়ালা মুচকি হেসে বলল, বাবুজী ঔর উন্‌কী লেড়কী গয়ি থি। ড্রাইভারকো পাশ ম্যায় শুনা হুঁ।

প্রকাশ খুশী হয়ে নোটখানা গালপাট্টাওয়ালার হাতে দিল। সে আধা মিলিটারী কায়দায় সেলাম করল।

—বাবু কা নাম ?

—গান্‌শোয়ার, বাঙ্গালী বাওয়ণ। বড়িঁয়া আদমী হ্যঁয় গানশোয়ার হাওলদার।

গাড়ির মালিকের সঙ্গে নামটাও মিলে গেল গনেশ্বর হালদার। তাহলে মানসী প্রিয়া বাঙালী বামুনেরই মেয়ে। সূচনা শুভ দেখে প্রকাশের বুকের ভিতর যেন রক্তের নাচন শুরু হল।

হঠাৎ এই সময় কারও ডাকে সাড়া দেওয়ার ভান করে গালপাট্টা-ওয়ালা বলল, হুজুর আ রহা হুঁ !

তারপর ক্ষিতীশ ও প্রকাশের দিকে চেয়ে বলল, দো মিনট কে লিয়ে আপ্‌লোগ বৈঠিয়ে। বলে গ্যাবেজের বাইরে এসে নিমেষের মধ্যে দরজাটা টেনে শিকল লাগিয়ে দিল। তার এই ক্ষিপ্রতায় বন্ধুদ্বয় ত অবাক।

প্রকাশ "এই এই ক্যা করতা" বলে চেঁচিয়ে উঠল। দরজা ধরে টানাটানি করল কিন্তু সবই নিষ্ফল।

সে হতাশভাবে বলল, শেষটায় বন্দী হলুম ! ব্যাপারটা কি বল দেখি ?

ক্ষিতীশ বলল, লোকটার মতলব বুঝতে পারছি না। তবে ব্যাপার শুভ নয় ঠিকই।

—এখন উপায় কি ?

ক্ষিতীশ বলল, তুমি এখন সুন্দরীর ধ্যান কর আর আমি বসে বসে হাই তুলি।

প্রকাশ আবার দরজার ভিতর দিকের কড়া ধরে জোরে টানতে লাগল। কিন্তু তারামত জোয়ানের টানেও পাল্লাগুলো একটু নড়ল না। খানিকক্ষণ টানাটানির পর বিরক্তির সুরে সে বলল, চেঁচাব? লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলব?

ক্ষিতীশ বলল, রুহু ধৈর্যম্। এখন ধৈর্য হারালে সুফল তো হবেই না বরং বিপদ হতে পারে। এই সময় গ্যারেজের পিছন দিকের গরাদের ফাঁক দিয়ে একটা মিষ্টি সুর ভেসে এল। শুরু হল নারী কণ্ঠের সঙ্গীত। সঙ্গে সঙ্গেই দরজার উপর প্রকাশেব আক্রমণ বন্ধ হল।)

প্রকাশ বন্ধুর দিকে চেয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, ঠিক।

—ঠিক আবার কি?

—রবিবার সিনেমায় এই গানটাই শুনেছি। "তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।" ডার্লিং সেই গানটাই গাইছে।

প্রকাশ গাড়ির উপব উঠে মেয়েটিকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু চলমান শাড়ীর আঁচল ছাড়া আব কিছুই দেখা গেল না। আর সেই সময় দরজার বাইরে রাস্তায় পদশব্দ শুনে ক্ষিতীশ বলে উঠল, কে যাচ্ছেন? দয়া কবে দরজাটা খুলে দিন।

বাইবে থেকে উত্তর এল—জরা ঠ্যায়রণে হোগা ইনস্‌পেক্‌টার সাব্। গালপাট্টাওয়ালা. র কণ্ঠস্বর।

ক্ষিতীশ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, ইন্‌স্‌পেক্‌টার কোন্ হ্যায়?

শোনা গেল গালপাট্টাওয়ালার জোরাল হাসি।

প্রকাশ বলল, ভাই ক্ষিতীশ শাড়ী ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

ক্ষিতীশ একটু বিরক্তির সঙ্গে বলল, এখন উচ্ছ্বাস থাক। তোমার প্রেমের শুরুতেই ত দেখছি এই বিপদ।

প্রকাশ দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, তা ঠিক, আমরা এই অবস্থায় ধরা পড়লে এ-বাড়ীর লোকে কি ভাববে ভাই?

—ভাববে অনেক কিছু, চোর ডাকাত··· ।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, ডার্লিংও ভাববে ?

—ওঃ, সিনেমার সেই সুন্দরী ? তার পক্ষে তোমাকে সাধু ভাববার যখন জোরাল কোন কারণ নেই তখন এই অবস্থায় দেখলে স্বভাবতই মনে করবে আমরা চুরি করতেই এসেছিলাম।

—যদি তাকে বুঝিয়ে বলা যায় ?

—সে সুযোগ পেলে ত ! আর যদি পাওয়া যায় তাহলে মনে করবে আমরা দু'টি একান্তই আনাড়ী গর্ধভ।

প্রকাশের মাথা ঘুরে গেল। সে বলল, কি করা যায় বল দেখি ?

—আপাতত চুপ করে বসে থাকা। অবশ্য তুমি চোখ বুজে সুন্দরীর নাম জপতে পার।

—নাম ! নাম ত জানা নেই। আচ্ছা লোকটার আমাদের পুলিশ মনে করবার কারণ কি ? আর পালিয়েই বা গেল কেন ?

—তোমার প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর আমার জানা নেই। শেষাংশের উত্তর ওর পুলিশকে ভয় করবার নিশ্চয় কোন কারণ আছে।

গ্যারেজের পূর্ব ও পশ্চিমে নিরন্ধ্র প্রাচীর।

উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ছাদের এর কিছু নীচে দেওয়ালের গায়ে সমান্তরালভাবে চারটি করে লোহার গরাদ বসানো।

একে ত ভাদ্রের ভ্যাপ্‌সা গরম, বাতাসের অত্যন্ত অভাব। তার উপর পেট্রল ও মবিলের গন্ধে দুই বন্ধু বিশেষ অস্বস্তি বোধ করছিল।

যে প্রেমের সূচনাতেই এত বিঘ্ন তার ভবিষ্যৎ ভেবে প্রকাশের চেয়ে দৃঢ় চিত্ত লোকও দমে যেত। সে বলল, প্রেমে যে এত কাঁটা তা আগে জানলে··· ।

—কাঁটার খোঁচাটা একটু পরে আরও ভাল করে টের পাবে।

—কেন পুলিশে দেবে নাকি ?

—নিশ্চয়। তোমার গ্যারেজে এই ভাবে দু'টো লোককে দেখতে পেলে তুমি কি করতে?

—তাইত। কিন্তু আমাদের অপরাধ?

—অনধিকার প্রবেশ, চুরির চেষ্টা।

মাথার উপর হঠাৎ দুমনি বস্তা পড়লেও প্রকাশের মুখ এতটা করুণ হত কিনা সন্দেহ।

উভয়েই নীরব। তারা কখনও কপালের ঘাম মোছে, কখনও রুমাল দিয়ে বাতাস করে। এই ভাবে কাটল কিছুক্ষণ। প্রেম ক্ষিতীশের নিজের নয়; প্রকাশের জন্যই তার এই দুর্দশা। একে তো গ্যারেজে এভাবে বন্ধ থাকাই কষ্টকর তার উপর আরম্ভ হল প্রকাশের হা-হুতাশ। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে লাগল সে। ক্ষিতীশের মনে হল অসহ্য।

প্রকাশের বেদনার গভীবতা উপলব্ধি করতে না পেরে সে বললে, ও রকম ফোঁস ফোঁস করছ কেন?

প্রকাশ একান্তই আবেগাক্রান্ত গলায় বলল, প্রতিদান তো দূরের কথা, তাকে একবার বুঝিয়ে বলবার সুযোগও পেলাম না। গরাদের ফাঁক দিয়ে মুখখানা একবাব দেখতে পেলে সে সুযোগ করে নিতাম। শুধু স্বর শুনলাম আব শাড়ীব আঁচলই দেখলাম।

—গলার স্বব ও ·াড়ী যে তার, তা বুঝলে কি কবে?

—মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। আর, ও গাইছিল ববিবারের সিনেমার সেই গানটি।

—ও গান ত তার মনোপলি নয়। লোকে ঘরে ঘরে গায়।

প্রকাশ কোন উত্তর করল না। আরও দুচার বার উঃ আঃ করে শেষটায় নীরব হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। প্রকাশ আবার গাড়ির ছাদে উঠে উঠানের দিকের গরাদ ধরে বাড়ির ভিতরটা দেখছিল।

ক্ষিতীশ বললে, কি দেখছ ?

—সিঁড়ি আর উঠান।

—বাড়ির কাউকে ?

—মনে হচ্ছে যেন একটি তরুণী এই দিকে আসছে। হ্যাঁ তরুণীই বটে ; বোধ হয় সেই হবে। মুখখানা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু কি ডিভাইনলি টল অ্যাণ্ড—

এই সময় দরজাটা খুলে গেল। দিনের বেলায় রুদ্ধ গ্যারেজে দু'টি বাঙালী তরুণ। তাদের মধ্যে একজন আবার গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে। দৃশ্যটা এতই অভাবিতপূর্ব যে গাড়ির মালিক কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

চমক ভাঙলে তিনি ডাকলেন, পরভিজ !

একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান সামনে এসে জঙ্গী কায়দায় সেলাম ঠুকে বলল, হুজুর !

লোকটির চেহারা যেন লোহায় গড়া। হাতে পিতলে বাঁধানো তেল চকচকে বাঁশের লাঠি।

পরভিজের আগমনে পুরা দস্তুর সাহস সঞ্চয় করে—গনেশ্বর অপরিচিত অবাঞ্ছিত অতিথিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কি মনে করে ?

প্রকাশ বলল, তোমরা নয়, আপনারা।

গনেশ্বর বললেন, আত্মসম্মান জ্ঞান ত খুব টন্‌টনে দেখছি। এদিকে চুরির মতলবে অপরের গ্যারেজে এসে ঢুকেছ। একজন আবার গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরটা ভাল করে দেখে নিচ্ছ।

প্রকাশ ততক্ষণে গাড়ির ছাদ থেকে নেমে পড়েছে। ক্ষিতীশ গনেশ্বরকে বলল, আসুন বাইরে গিয়ে সব বলছি।

সে ও প্রকাশ গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতেই গনেশ্বর বললে, পরভিজ, পাকড়ো।

প্রকাশের বপুর বহর দেখে পরভিজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে আমতা আমতা করে বলল, পাক্‌ড়েগা জরুর লেকিন···

গনেশ্বর বললেন, লেকিন কিরে ?

—লেকিন ডাকু লোক হ্যায়।

চোর থেকে ডাকাত। নিজেদের এই দ্রুত প্রমোশনে ক্ষিতীশ বা প্রকাশ মোটেই খুশী হতে পারল না।

প্রকাশকে শার্টের আস্তিন গোটাতে দেখে পরভিজ চীৎকার শুরু করে দিল, ডাকু, ডাকু।

প্রকাশ পরভিজের দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, 'স্টপ্, স্টপ ইউ রাস্কেল' !

ক্ষিতীশ গনেশ্বরকে বলল, আপনার দারোয়ানকে চেঁচাতে বারণ করে দিন। তারপর শুনুন আমাদের কি বলবার আছে।

গনেশ্বরবাবু বললেন, এযে দেখছি একেবারে হাই-কমাণ্ড।

—নিশ্চয়। ভদ্রলোকের ছেলেদের আপনি না-হক অপমান করতে পারেন না।

পরভিজ এবার নতুন একটা আবিষ্কার করে ফেলল। বলল, স্বদেশী ডাকু হ্যায়। পিস্তলভি রহনে সকতা।

ডাকাতদের মধ্যে আবার কুলীন শ্রেষ্ঠ স্বদেশী ডাকাত !

অবস্থাটা আরও সঙ্গীন। চকিতে ক্ষিতীশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল, আমরা একটা এনকোয়ারী করতে এসেছিলাম ; আপনার ড্রাইভার···

সঙ্গে সঙ্গেই গনেশ্বরের মুখের চেহারা বদলে গেল : আপনারা আসছেন কোত্থেকে।

—মোটর ভেহিকল্‌স্ থেকে। আপনার গাড়ির······

তাকে বাধা দিয়ে গনেশ্বর বললেন, দেখুন মশাই গালপাট্টাকে যত বলি, দেখ লোকটার কি হল, ব্যাটা ততই গাড়ির স্পীড বাড়ায়।

ক্ষিতীশের মনে হল আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মত সেও একটা মন্তর আবিষ্কার করে ফেলেছে। এবার সে আরও গম্ভীর কণ্ঠে বললে, বেআইনী কাজ করে আবার আমাদের আটকে রেখে পালিয়েছে।

গনেশ্বর বিনীতভাবে বললেন, কিছু মনে করবেন না। লোকটা একের নম্বরের স্কাউণ্ড্রেল। আপনারা কোথেকে আসছেন বুঝতে পেরেছি। থাক, যাকে চাপা দিয়েছে তার—অবস্থা?

—গাড়ি চাপা পড়লে যা হয়।

—এ্যাঁ, মারা পড়েছে! আর ড্রাইভার বেটা গেল কিনা পালিয়ে!

প্রকাশ ক্রমশই ব্যস্ত হয়ে উঠছিল। সে প্রশ্ন করল, সেদিন কি আপনারা সিনেমায় গিয়েছিলেন?

ক্ষিতীশ বলল, সে কথা এখন থাক।

গনেশ্বর বললেন, না মশায় তবে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে সিনেমা পাড়ায়।

প্রকাশ বলল, আপনার ঠিক মনে আছে যে আপনাদের কেউ বায়স্কোপে যায় নি।

—ঠিকই মনে আছে, না যায় নি।

—কোন আত্মীয় স্বজন গাড়ি চেয়ে নিয়েছিলেন?

—না স্যার, সমস্ত দিন গাড়ি গ্যারেজে ছিল। রাত্তির ন'টার কিছু আগে আমি এক বন্ধুকে পৌঁছে দিতে শ্যামবাজার সিনেমা পাডায় যাই।

—গাড়িতে কোন মেয়েছেলে ছিল না কি?

—না।

প্রকাশ দেখল, গাড়ির নম্বর নিতে তার ভুল হয়েছে। ছি ছি কি অপদার্থ সে। সিনেমার সেই সুন্দরীর খোঁজ করার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না দেখে তার মন ভারাক্রান্ত হল।

ক্ষিতীশ ঘটনার পরিণতিতে বেশ কৌতুক অনুভব করছিল। একটু আগে তারা ছিল চোর, ডাকু। আর এখন সেই অভিযোগকারীই যেন তাদের অনুগ্রহ প্রার্থী। গনেশ্বরের চোখে পুলিশের লোক এরা, এসেছেন এনকোয়ারী করতে।

প্রকাশ পাছে ধরা দেয় এই ভয়ে ক্ষিতীশ এনকোয়ারী চালাতে লাগল। বলল, সেদিন গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন আপনি?

গনেশ্বর বললেন, না স্যার, আপনারা নিজেরাই ত দেখলেন দোষ কার? তাই ব্যাটা আপনাদের আটকে রেখে একেবারে শেয়ালের মত চোঁ চা হাওয়া।

ক্ষিতীশ গম্ভীরভাবে বলল, 'ও আই সী'। আচ্ছা আপনার গাড়ি চালাবার লাইসেন্স ছিল না?

গনেশ্বর বললেন, আমার চালাবার লাইসেন্স অবশ্য ছিল কিন্তু রিনিউ করিনি।

—রিনিউ না করে···

বাধা দিয়ে গনেশ্বর বললেন, বিশ্বাস করুন রিনিউ যেমন করিনি তেমনি ড্রাইভও করিনি।

ক্ষিতীশ বলল, বিশ্বাস করা কঠিন। তবে আপনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক যখন বলছেন তখন বিশ্বাস না করাও তো ঠিক নয়।

—ধন্যবাদ স্যার, দেখবেন যাতে বিপদে না পড়ি।

ক্ষিতীশ বেশ মুরুব্বিয়ানার চালে বলল, আচ্ছা।

গনেশ্বর বললেন, মাপ করবেন। আগে বুঝতে পারিনি আপনারা পুলিশ অফিসার। যাক, আপনারা একটু চা খেয়ে যান।

ক্ষিতীশ বলল, গ্রীষ্মের দুপুরে আর চা খেয়ে···

—তবে চা থাক, একটু লেমন স্কোয়াস···

ক্ষিতীশ মৃদু হেসে বলল, আর এক দিন হবে।

ফেরার পথে প্রকাশ বন্ধুকে বাহবা জানাল, কি চালটাই না চাললে।

ক্ষিতীশ বলল, তোমার মত হা-হুতাশ করলে তো এতক্ষণে থানার হাজতে পচতে হত।

প্রকাশ বলল, তা ত হল কিন্তু এখন উপায় ?

—ভালয় ভালয় বেরিয়ে আসতে পেরেছ বলে আপাতত ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।

প্রকাশ চিন্তিত মুখে বলল, কিন্তু তার ঠিকানাটা ?

—সে পরে হবে। একদিনের পক্ষে আজকের এই অ্যাডভেঞ্চার কি যথেষ্ট নয় ?

৩

ডক্টর সুশনীগের সঙ্গে ব্রেৎস্‌গাদেনে সাক্ষাতের সময় হিটলারের তর্জন গর্জনই এ যুগের মানসিক উত্তেজনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বোধ হয় তারপরই স্থান পাবার যোগ্য অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর রায় বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায়-এর আজকেব মানসিক উত্তেজনা। তিনি হলের মধ্যে ঘোরেন আর এক একবার টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করেন, ঝনঝন শব্দে দোয়াতদানি ও গ্লাস কেঁপে ওঠে আর রায় বাহাদুর গর্জন করেন—অল রট্‌। কখনও বা টেবিলের ওপর থেকে গ্লাস তুলে চুমুক দেন।

তার মনে হয় যুগ যুগ ধরে জাতটা যে পর-পদানত তার কারণ শুধুই মিথ্যাচার। শাসক গোষ্ঠী এবং বিরোধী দল সকলেই অসাধু। সাধু যে দু' একজন আছেন তাঁরাও ভোটের খাতিরে দল রাখবার খাতিরে মিথ্যাচারকে অসততাকে প্রশ্রয় দেন। ধনীরা ফাটকা বাজারে জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, ব্যবসায়ীরা খাদ্যে আর ওষুধে ভেজাল মেশায়। সর্বহারা শ্রমিকের দরদী সেজে ট্রেড ইউনিয়নিস্টরা উভয় পক্ষের অর্থে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স পুষ্ট করে। রিফিউজী ক্যাম্পের সরকারী চাকরীয়ারা বাস্তুহারার তণ্ডুল

মুষ্টিতে ভাগ বসায়—এই তো আমাদের জাত। সাহিত্যক্ষেত্রেও এই অসাধুতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস 'বিধিলিপির' জন্য তিনি সাড়ে সাত শ' টাকা দিলেন। রেজিস্ট্রি ডাকে কপি এল। পার্সেল খুলে দেখেন বই-এর অর্ধেকের উপর পাতাই নাই। পার্সেলটা খুলেছেন অবশ্য একদিন পরে, কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অর্ধেক কপি উধাও হল কেমন করে ? তবে কি তরুণ চৌধুরী সম্পূর্ণ বইটা পাঠায় নি ? না, খোয়া গেছে এইখানে ?

জটিল এ প্রশ্নের কোন উত্তর না পেয়ে তিনি আবার গেলাসে চুমুক দিয়ে কলিং বেল টিপলেন।

খর্বাকৃতি একটি লোক ঘরে ঢুকল। লোকটির চোখ দু'টি উজ্জ্বল, দেহ ঈষৎ স্থূল আর বয়স পঞ্চাশের উপর।

হলধর তাকে সম্ভাষণ করলেন, উট্রাম ?

উট্রাম প্রভুর মুখের দিকে তাকাল।

হলধর বললেন, অল্ রট্, উট্রাম।

উট্রাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

গেলাসের অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে হলধর বলে উঠলেন, ইউ আর এ ফুল উট্রাম।

উট্রাম ভাবল, বোকা সে নিশ্চয়ই নইলে একদিনের জন্যও হাকিম হতে পারল না কেন ?

হলধর বললেন, উট্রাম এই বইখানার অর্ধেকটার উপর খোয়া গেছে।

—হ্যাঁ, একটু আগেই ত আপনি বলেছেন।

—ব্যাপারটা কি বল দেখি। পার্সেলটা তুমি নিজে দেখে নিয়েছিলে ? শীলমোহর ঠিক ছিল ;

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিল ?

—তবে ? বইটার অর্ধেকটা এখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল কি করে ?

উট্রাম বলল, তরুণবাবু হয়ত বইখানা পুরো পাঠান নি।

—তার মতলব ?

উট্রাম কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় হলধর বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে বললেন, যাও—কক্‌টেইল্।

উট্রাম সাগ্রহে এই আদেশেরই অপেক্ষা করছিল। কক্‌টেইল শুনে সে আর মুহূর্ত বিলম্ব করল না। একটু পরে—হুইস্কি, বিয়ার ও রাম একটা বড় গ্লাসে পাঞ্চ করে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

হলধর বললেন, খোকনবাবু।

একটু পরেই প্রকাশ ঘরে ঢুকলে হলধর বলে উঠলেন, বাঙালী জাতটা বড় ডিগ্রেডেড।

আর কেউ একথা বললে প্রকাশ প্রতিবাদ করত।

ভেরি মাচ্ ডিগ্রেডেড—বলে রায়বাহাদুর ককটেইলে একটু চুমুক দিলেন।

প্রকাশ নীরব।

—কি হয়েছে জান প্রকাশ ? ওঃ, ৩৮০ ধারা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্।

প্রকাশ মাতামহের দিকে চেয়ে রইল।

হলধর বললেন, ফৌজদারী আইনে যাকে বলে ৩৮০ ধারা।

প্রকাশ আইন পড়েনি। ৩৮০ ধারার অর্থ বুঝতে পারল না।

হলধর বললেন, এখন থেকে তুমি নিজেকে একজন ডিটেক্‌টিভ মনে করবে। অবশ্য প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্।

আচমকা এই প্রস্তাবটায় প্রকাশ খুশী হতে পারল না। কেন না সকালেব গোয়েন্দাগিরির স্মৃতি তার মনে তখনও তাজা ছিল।

হলধর টেবিলের উপরের একখানা পুঁথি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই যে দেখ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একখানা অমূল্য রত্ন যা নিয়ে আমি রিসার্চ করছি।

প্রকাশ দেখল, টেবিলের উপরে একখানা তালপাতার হাতে-

লেখা পুঁথি। উপর ও নীচে দু'খানা কাঠ দিয়ে বাঁধা। প্রথম পাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায়…

নীচে লেখা, তারাসুন্দরীর পাতিব্রত্য, কাত্যায়নীর কর্মনৈপুণ্য, রমাপ্রসন্ন ভট্টর বন্ধুপ্রীতি, রঘুনাথের দস্যুতার কাহিনী সম্বলিত অনবদ্য গ্রন্থ। বিধিলিপি বঙ্গ ভাষায় রচিত। রচনার সন ১১৭৬ বঙ্গাব্দ। লেখক বঙ্গচন্দ্র তর্কবাগীশাত্মজ হংসেশ্বর তর্কবাগীশ, বাস্তবা কোতোয়ালীপাড়া, পূর্ববঙ্গ ভুক্তি।

হলধর বললেন, এই বই-এর ব্যাপার নিয়েই গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

—কি রকম?

—শোন তবে। খুব সহজ ও সরল। পুঁথি চুরি। এই বই-এর খানিকটা অংশ তরুণ নামে এক ছোকরা সাহিত্যিক আমাকে শুনিয়ে যায়। ভারী ভাল বই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ডায়েরীর মতন কবে লেখা। এইখানাই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম উপন্যাস, অথচ টেকনিক্ মডার্ন। তাছাড়া ভাষাও সহজ, মোটেই সংস্কৃত বহুল নয়। বঙ্কিম বিদ্যাসাগর এমনকি রাজা রামমোহনের আগে এমন সাবলীল গদ্যে বই লিখেছেন এই তর্ক-বাগীশ। সাহিত্যেব এমন একখানা অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করতে আমার যে আগ্রহ হবে তা তুমি হজেই বুঝতে পার।

তরুণ বলে, বইএর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তার দেশে আছে। কিছু-দিন পরে সে বাড়ি গেলে আমি ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিই। বইএর পুরো দাম সাড়ে সাতশ' টাকা।

তরুণ বইও পাঠিয়েছে কিন্তু আজ খুলে দেখছি বইখানা অসম্পূর্ণ। সে বলেছিল পুঁথিতে ৫০০ পাতা আছে। এখন দেখছি দুশো পঁচিশেরও কম।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, এই তরুণটিকে আপনি চিনলেন কি করে?

—কেন তাকে তুমি দেখ নি ? আরও হু'দিন এসেছিল।

—না।

প্রথম তার সঙ্গে এক সাহিত্যিকের বাড়িতে দেখা হয়। তারপর আলাপ হয় সাহিত্য সেবক সমিতিতে। যাক এই নিয়ে তোমায় এনকোয়ারী করতে হবে। দরকার হলে যেতে হবে চিনপিনেয়।

—সে কোথায় ?

—পুরুলিয়া জেলায়, আদ্রার কাছে।

—সেখানে কেন ?

—দেশ বিভাগের পর কোতোয়ালীপাড়া ছেড়ে তরুণরা এসে চিনপিনেয় বাড়ি করেছে।

—তাকে একখানা চিঠি লিখে দিলে হয় না ?

—কথাটা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের মত হল না ভাই। সে তো লিখবেই সে পুরো বই পাঠিয়েছে।

—যদি তাই সত্য প্রমাণিত হয় ?

তাহলে গোপনে তোমাকে গবেষকদের বাড়ি বাড়ি সন্ধান করতে হবে। এই শহরে হাজারো বইচোর ও সাহিত্য তস্কর আছে। পরের লেখা পরের পবিশ্রমলব্ধ তথ্য চুরি করে নিজের নামে চালানই এদের ব্যবসা। প্রথম বাংলা উপন্যাসের আবিষ্কারক বলে আমি যে-সম্মানের অধিকারী হতে চাই এরা আমায় তা থেকে বঞ্চিত করবে।

প্রকাশ বলল, হ্যাঁ শুনেছি একদল আছে তাদের ব্যবসাই ঐ।

হলধর বললেন, এদের আমি পুলিশে দেব।

পরক্ষণেই তার চিন্তার ধারা বদলে গেল। তিনি বললেন, অল্ রট্। আমিই কি চোর নই ? ধর যদি এরূপ সুযোগ পাই তাহলে আমিও কি অপরের পুঁথি সরাতে দ্বিধা করব ? হে হে তুমি বোধ হয় ততটা বোকা আমাকে মনে কর না।

প্রকাশ কোন মতামত দিল না।

রায় বাহাদুর আবার আরম্ভ করলেন, অথচ দশ বছর আগে আমিই এরূপ একজনকে অন্তত দু'বছর জেল দিতাম।

প্রকাশ বলল, সেই কাজ এখন নিজে তুমি করতে পার?

হলধর বললেন, ফ্রেলটি অব হিউম্যান নেচার—এখন করতে পারি ভাই। অথচ আমি অসাধু নই, চোর ত নইই, তবে কিনা রিসার্চের ব্যাপারে পুব ও পশ্চিম দু' দেশেই ওটা হয়ে থাকে।

রায় বাহাদুরের চিন্তা ধারার আবার পরিবর্তন হল। তিনি দৌহিত্রকে প্রশ্ন করলেন, সাহিত্যে গবেষণার জন্য আমার কিছু নাম হচ্ছে?

প্রকাশ বলল, তোমার মোস্লেম বৈষ্ণব কবি প্রবন্ধটা উঁচুদরের।

—তুমি নিজে পড়েছ?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ। আবিষ্কারক হিসেবে নামটা আরও ছড়িয়ে পড়তে পারত। এভারেস্টের আবিষ্কারক যেমন রাধানাথ সিকদার। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের আবিষ্কারক তেমনি হলধর চট্টো। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা দুর্ভাগ্যক্রমে চুরি হয়ে গেল। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমিই এই চুরির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পার। বইখানা তরুণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হংসেশ্বরের লেখা। তিনি ছিলেন দিকপাল পণ্ডিত। প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করে মাথায় ধুলো ঝেড়ে দিতেন।

প্রকাশ বলল, 'কুইয়ার কমবিনেশন'। টুলো পণ্ডিত লিখলেন কিনা উপন্যাস। তাও সে যুগে।

—প্রতিভা…প্রতিভা। প্রতিভার যাদুস্পর্শে সবই সম্ভব।

—কিন্তু বড় অসহিষ্ণু ছিলেন ত। তোমার ঐ হংস।

হলধর বললেন, পণ্ডিতরা ওরকম হয়েই থাকেন। উট্রাম।

সঙ্গে সঙ্গেই উট্রাম ঘরে ঢুকল রায় বাহাদুর বললেন, গেলাস খালি হয়েছে, দেখছ না।

উট্রাম দাঁড়িয়ে রইল।

হলধর বললেন, আমি বুঝি বলিনি কি আনতে হবে? শেরী, উট্রাম। বুড়ো বয়সে কী ভুলই না হয়েছে। শ্যাম্পেন বলতে বলি শেরী। অল রট।

উট্রাম বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রকাশ বলল, একটু দাঁড়াও ত উদয়দা। দাহু তুমি আজ আর মদ খেতে পাবে না।

রায়বাহাহুর বললেন, কেন?

—আমার অনুরোধ।

—তোমার মা ঠিক এমনি করে বলত। আর বলতেন তোমার দিদিমা। উট্রাম।

—আজ্ঞে।

রায়রাহাহুর বললেন, তুমি একটা···

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রকাশ বলল, তুমি এখন যাও উদয়দা।

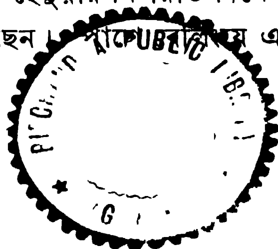
উদয় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হলধর বললেন, মদের হুকুম করলে ওর ভারী ফুর্তি। ভাগ বসাতে পারে কি না। হয়ত প্রসাদ করেই দেয়।

প্রকাশ জানত, এর জন্য দায়ী তার মাতামহ। সে তাই কোন উত্তর করল না। হলধর বললেন, উট্রামের নেশা হয় না। মদ খেয়ে যার নেশা হয় না, সে একটা ভিলেইন।

প্রকাশ একটু পরে বেরিয়ে উট্রামকে ডেকে বলল, দাহুকে আজ আর তুমি মদ দিও না, উদয়দা।

৪

দিন-কয়েক পরের কথা। তরুণের খোঁজে প্রকাশ বাগবাজার যাচ্ছিল। পথে ট্রাম থেকে দেখল, হেতুয়ার বিপরীত দিকে পশ্চিম ফুটপাথে এক জ্যোতিষী বসে আছেন। [illegible] একখানা



হাতে লেখা বিজ্ঞাপন ঝুলছে। বিডন স্ট্রীটের মোড়ে সে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল।

জ্যোতিষীর কাছে এসে বিজ্ঞাপনখানি পড়ল :

তিব্বতী মতে ভাগ্য-গণনা করি। মামলা ও প্রেমের ফলাফল বলে দিতে পারি। বশীকরণ মন্ত্র জানি, গ্রহ-শান্তির কবচ দেই। সকলই সুলভ—

রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন।

বিজ্ঞাপনের নীচে গৌরবর্ণ একটি লোক বসে আছেন। কালো কুচকুচে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, কপালে ত্রিশূল আঁকা। তাঁর দু'টো বাহু লাল, মধ্যেবটি সাদা। গায়ে ভৃগু নামাবলীর ফতুয়া।

ভৃগুলাঞ্ছনের সামনে জলচৌকিতে পিতলের চারটি ছক, কয়েকখানা পুঁথি এবং খেরুয়ায় বাঁধা একটা খাতা ও একটা ফাউন্টেন্ পেন।

প্রকাশ সামনে গিয়ে দাঁড়ালে জ্যোতিষী পিছন থেকে একখানা মাদুর বার করে ফুটপাথে পেতে দিয়ে বললেন, বসুন।

বেলা তখন দু'টো। রোদ খাঁ খাঁ করছে। পথে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। প্রকাশ তবু এদিক ওদিক তাকিয়ে আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাঙালী?

—হ্যাঁ, বাঙালী বামুন। নিকষ কুলীন। তিব্বতী মতে জ্যোতিষ শিক্ষা করেছি নেপাল ও তিব্বতের মাঝখানে হিমালয়ের এক গুহায়। আমার গুরু হলেন দলাই লামার শ্রেষ্ঠ শিষ্য চোলাইলামা।

প্রকাশ দু'হাত তুলে তাঁকে প্রণাম করলে ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, দীর্ঘজীবী হোন। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। অবশ্য রামবাঞ্ছার কাছে যখন এসেছেন, মনোবাঞ্ছা তখন পূর্ণ হবেই।—আপনিও কি ব্রাহ্মণ?

—আমিও ব্রাহ্মণ। দেখুন—বলে প্রকাশ হাত বাড়িয়ে দিলে ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, আগে এখানা পড়ুন।

কাগজখানি হাতে লেখা মূল্য তালিকা।

সাধারণ হাত-দেখা—১৯ নয়া পয়সা, চাকুরী গণনা—২৮ নয়া পয়সা, প্রেম গণনা—৪৯ নয়া পয়সা, চুরি গণনা—৩৭ নয়া পয়সা। কবচ গ্রহানুযায়ী—১টাকা হইতে উর্ধ্বে। রাশি গণনা—৩২ নয়া পয়সা।

তালিকা পড়ে প্রকাশ বলল, মূল্যের জন্য আটকাবে না। দয়া করে হাত দেখুন।

ভৃগুলাঞ্ছন প্রথমে প্রকাশের ডান হাত দেখলেন। পরে বাঁ-হাত। শেষে দু'খানা হাত পাশাপাশি রেখে আঙুলের ডগা টিপে টিপে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষান্তে বললেন, মশাই ভাগ্যবান পুরুষ। তবে বর্তমানে সময়টা কিছু মন্দ।

প্রকাশ চুপ করে রইল। ভৃগুলাঞ্ছন জ্যোতিষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তার দিকে চেয়ে বললেন, মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

প্রকাশের মুখের ভাবের একটু পরিবর্তন হল।

ভৃগুলাঞ্ছন পেতলের ছক চারটি ডান হাতের মধ্যে নেড়ে পাশার ঘুঁটির মত ফুটপাতের উপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর ছকের অঙ্ক দেখে একখানা কাগজে লিখলেন।

চং ৩ × ৭ = ২১

মং ৪ × ৫ = ২০

সং ৮

মোট— ৪৯

তারপর বললেন, এই হল তিব্বতী গণনা। নেপালে কপিল-গ্রামে শিখেছি।

প্রকাশ প্রশ্ন করল, কি বলছে আপনার তিব্বতীয় মত?

সংখ্যা পাচ্ছি ৪৯, অতএব আপনি প্রেমার্ত হয়েছেন, ৪৯ প্রেমের সংখ্যা।

এবার প্রকাশের চোখে বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, গণনা ঠিক নয় কি ?

—হ্যাঁ।

—চোলাই লামার তিব্বতী চক্রপাতন কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু ....

বাধা দিয়ে প্রকাশ বলে উঠল, কিন্তু কি, সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, এই ত ?

জ্যোতিষী বললেন, আপাতত সেই রকমই মনে হচ্ছে। প্রতিদান পেতে বিলম্ব হবে।

—প্রতিদান ত দূরের কথা সে জানে না যে আমি তাকে ভালবেসেছি। আমি তার নাম ঠিকানা পর্যন্ত জানি না।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, অপরিচিতার প্রতি প্রেম প্রগাঢ়ই হয়ে থাকে।

—খুবই প্রগাঢ় ঠাকুরমশাই, এখন পরিচয়ের উপায় কি ?

—একটা ফলের নাম করুন।

—আতা। ,

—না, একটা শক্ত ফলেব নাম করুন।

—কাঁঠাল।

জ্যোতিষী বললেন ফলটা কণ্টকাকীর্ণ। আপনার প্রেমে বাধাবিঘ্ন আছে।

—বাধা খুবই, এভারেস্টে ওঠার মতন কঠিন ব্যাপার।

আপনি মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রেমে পড়ে থাকেন। প্রেমে পড়া আপনার একটা ব্যাধি।

প্রকাশ বলে উঠল, নন্‌সেন্স্‌। এর আগে প্রেমে পড়াকে আমি ঘৃণা করতুম। এই আমার প্রথম প্রেম, এই শেষ।

জ্যোতিষী বললেন, এটা আমি বলছি ভৃগুর মতে; চোলাই লামার নয়। কিন্তু ভৃগু ত কখনো মিথ্যা হয় না। তিব্বতীয় মতের পর কাশীতে ভৃগু পড়েছি স্বামী বিহ্বলানন্দর কাছে। তিনি

আমাকে ভৃগুলাঞ্ছন উপাধি দিয়েছেন। ভৃগুমত বলছে, আপনার প্রেমাস্পদা সুন্দরী।

উৎসাহিত হয়ে প্রকাশ বলে উঠল, শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী। ডিভাইনলি টল অ্যাণ্ড ডিভাইনলি ফেয়ার। ডেসডিমনা, শকুন্তলা, উর্ব্বশী, নূরজাহান।

জ্যোতিষী বললেন, বুঝেছি। আপনার বয়স কত?

—সাতাশ বছর তিন মাস।

—রাশি?

—বৃষ।

—কোথায় প্রথম দেখলেন তাকে?

—সিনেমায়।

প্রেমের উত্তম স্থান, বিশেষত বিষের অর্থাৎ বৃষ রাশির পক্ষে। আপনি কোন দিকে মুখ করে বসেছিলেন?

—উত্তর।

—সেই মহিলা?

—মহিলা না তরুণী।

—বেশ বেশ, সেই যুবতী?

প্রকাশ বলল, আই প্রোটেস্ট, যুবতী শব্দে আমার আপত্তি আছে। সেও আমার পাশে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছিল।

ভৃগুলাঞ্ছন এবার চোখ বুজে দু'বার নিজের নাকের ডগা টিপে আপন মনে আওড়াতে লাগলেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা···বাকীটা প্রকাশ শুনতে পায়নি।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, তিনমাস পরে বৃহস্পতিতে বৃষের সংক্রমণ হবে তখন ফল শুভ।

—তিনমাস বড় দীর্ঘ সময়।

—বর্তমানে ভারত রাহুগ্রস্ত, বিশেষ করে উত্তরে অর্থাৎ আসামে রাহু বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আপনিও রাহুগ্রস্ত। অতএব

সম্প্রতি সুফল লাভের আশা করা যায় না, বিশেষত এটা যখন আপনার একমাত্র প্রেম।

—ঠিক বলেছেন জীবনে আর কখনো প্রেমে পড়ব না। যে তাকে একবার দেখেছে লাঞ্ছনা ঠাকুর······

—লাঞ্ছনা নই আমি ভৃগুলাঞ্ছন।

—ক্ষমা করবেন, তার ঠিকানা কি আপনি গণনা করে বার করতে পারেন। তিন চারজন জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলুম, কেউ পারেন নি।

—আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। কলকাতার অনেক রাস্তার নাম ইংরেজী। ঐ সব নামের সঙ্গে হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত তিথি নক্ষত্রের সংস্থান করা অসম্ভব। তবে ভণ্ড জ্যোতিষীরা ঐ রকম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কবে থাকেন। কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছনের পক্ষে সেরূপ করা অসম্ভব।

—অন্তত তার পরিচয়টা? কি জাত সে?

—তিনি স্বরূপা, দেবগণ, ব্রাহ্মণবর্ণ।

—ঠিক বলছেন ত, আমিও ব্রাহ্মণ, একটু ভাল করে দেখুন।

—তাহলে আপনার লগ্ন বিচার করতে হবে।

লগ্ন গণনার ..রিশ্রমিক মূল্য তালিকায় নেই অথচ গোচরে চন্দ্রশুদ্ধি বিচার করতে গেলে···

প্রকাশ পকেট থেকে দশটাকার একখানা নোট বার করে বলল, এই নিন আপনার যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। লগ্নটা গুণে দয়া করে বলুন কত দিনে চন্দ্রশুদ্ধি হবে।

জ্যোতিষী প্রকাশকে ভ্রু কোঁচকাতে বললেন। প্রকাশ ভুরু কোঁচকালে তার কপালের বলিগুলো গুণে রামবাঞ্ছা আর একবার তার হাত দেখলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি বৃষই বটেন অর্থাৎ বৃষরাশি। আপনার প্রেমিকা হলেন মেষ অর্থাৎ মেষরাশি।

প্রকাশ বলল, একেবারে রাজযোটক। মেষ, বৃষ যা হোক,—এর ফল?

—চন্দ্রের অন্তর্দশায় শুভফল।

—কতদিনের মধ্যে?

—সূচনা হয়ত মাসখানেকের মধ্যেই হবে।

—কি শুভ?

—আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

—রাইট ও, ইউ আর অ্যান অ্যাস্ট্রোলজিকাল জিনিয়াস। বলে প্রকাশ জীর্ণ জলচৌকির উপর ঘুসি বসিয়ে দিল।

—ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, আমি ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ।

—ও কিছু নয়।

—বুঝেছি একটা উচ্ছ্বাস মাত্র। আপনার ঘুসির বহর দেখে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়ল, তিনি বলেছেন কামার্ত অর্থাৎ প্রেমার্ত মানুষের চেতন ও অচেতন জিনিসে ভেদবুদ্ধি থাকে না।

প্রকাশ বলল, এ আমার কাম নয়, পবিত্র প্রেম। পিওর লভ্।

—সে আর বলতে হবে না। আপনার হাত দেখেই বুঝেছি যে, এটা আপনার কুন্দশুভ্র প্রেম। যাক্, এই শুভ ফলের সম্ভাবনাকে দৃঢ়তর করবার জন্য গোমেদ ধারণ করলে ভাল হয়।

—তার খরচা কত?

—রাহুর পুজো, দ্রব্যমূল্য, গোমেদের মূল্য, ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণা ইত্যাদিতে অবস্থা ভেদে ১২৲ টাকা ৫৭ নয়া পয়সা থেকে শুরু করে ৪৮৲ টাকা ৯৫ নয়া পয়সা পর্যন্ত।

—তাহলে ফল সুনিশ্চিত?

—নিশ্চয়!

—কাল এই সময় পঞ্চাশ টাকা পাবেন। আপনি নিজে পুজো করবেন।

প্রকাশ মাথা নুইয়ে জ্যোতিষীকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন : আপনার শুভ হোক। শীঘ্র মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

—দেখবেন স্যার, যাতে পূজোটা বিধিমতে হয়!

আমি স্যার নই। পুজো আপনার ভৃগুমতেই করব। আমি ভৃগু ও চোলাই লামার সমন্বয় ঘটিয়েছি।

প্রকাশ চলে গেলে একটি কনস্টেবল জ্যোতিষীর সামনে এসে বলল, চোলাই বাবা, পাঁচ রোজকা পয়সা নেহি মিলা। আজ জরুর দেনে হোগা। নেহি দেনেসে পুলিশ ভ্যানমে চড়নে হোগা।

দশ টাকার নোটখানা দেখিয়ে জ্যোতিষী বললেন, জমাদার সাব, নোট খানা ভাঙিয়ে পাঁচদিনের গ্রহশান্তি করব।

—ঠিক হ্যায়, ছ রোজকে ওয়াস্তে বারা আনা মিলনা চাহিয়ে।

৫

বাগবাজার স্ট্রীটের উপর লম্বা খোলার বাড়ি। বাইরে দেওয়ালে ঘুঁটে শুকোচ্ছে। ভিতরের উঠানে ভাগে ভাগে কয়লার গুল, ডালের বড়ি, ভিজে আতপ চাল।

একটি ঘরের রান্দায় একজন বৃদ্ধ বসে বসে তামাক টানছেন। চুলের গোছা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে উঠানে এক মহিলা রোদ পোহাচ্ছেন।

প্রকাশ দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, তরুণবাবু আছেন ?

সে দু'তিনবার ডাকার পর তামাকুসেবী বৃদ্ধ উঁচু গলায় ডাকলেন, তরুণ, তোমায় কে ডাকছেন, দেখ।—তারপরই প্রকাশকে বললেন, আপনি ভেতরে আসুন।

উঠানে স্ত্রীলোক বসে থাকায় প্রকাশ ইতঃস্তত করছিল। কিন্তু যার জন্য এই সঙ্কোচ, তিনি তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না।

তামাকুসেবী আবার ডাকলেন, আসুন মশাই।

প্রকাশ এবার সঙ্কোচ ত্যাগ করে ভেতরে গেলে বৃদ্ধ তাকে বসার জন্য একখানা জলচৌকি দিলেন।

বারান্দার উত্তরে রান্নার জায়গা, দক্ষিণে অভ্যাগতদের বসবার স্থান। মাঝখানটায় দেড়হাত উঁচু দেওয়াল। প্রকাশের পিছনেই একখানা বড় থালায় ভুক্তাবশেষ পড়ে আছে। এই অবশিষ্টাংশের পরিমাণ ও পূর্ণ-পাম্প-করা পলহীন ফুটবলের মত তামাকুপায়ীর ভুঁড়ি ও তাঁর তেল চকচকে মুখ দেখে এই তিনের সঙ্গে প্রকাশ একটা সম্বন্ধ কল্পনা করে নিল।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই তরুণের নিকট এসেছেন শ্রাদ্ধক্রিয়া না সাহিত্যক্রিয়ার জন্য ?

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, উনি দু'কাজই করে থাকেন বুঝি ?

—তরুণ বহুক্রিয়ান্বিত।

—আমারও ঐ রকম লোকেরই দরকার।

—সাধু সাধু। আপনার উদ্বাহ সমাধা হয়েছে ?

—পাত্রী খুঁজছি।

—বলেন কি ? আপনার মতন রূপবান গুণবান লোকের পাত্রী খুঁজতে হয় ?

—খুঁজতে হচ্ছেই, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে জুটছেও না।

—হেঃ হেঃ, এযুগে এটা রূপকথার মতই শোনায়। আপনি কি ?

—ব্রাহ্মণ, রাঢ়ী শ্রেণী।

—গোত্র ?

—ভরদ্বাজ।

—তামাকুসেবী এবার উঁচু গলায় ডাকলেন, খাতাটা নিয়ে আয় ত বাঁটুল।

খেরুয়ায় বাঁধানো প্রজাপতির দপ্তর।

প্রকাশ বলল, পাত্র-পাত্রীর তালিকা বুঝি ? প্রয়োজন নেই।

—সে কি মশাই, উদ্বাহ একটা বেদোক্ত ক্রিয়া, উৎ পূর্বক বহ ধাতু, তার উত্তর ঘঞ।

—বেদের খবর আমরা বহুদিন রাখি না।

—নিশ্চয় রাখি, গায়ত্রী বেদ প্রত্যহ আমরা জপ করি। আমাদের গীতা বেদ, চণ্ডী, ভাগবত, মনসা মঙ্গল সবই বেদ, অপৌরুষেয়। ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী।

প্রকাশ এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, তা বটে।

এই সময় স্থূলোদর বেঁটে খাটো একটি কিশোর প্রজাপতির দপ্তরখানা রেখে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, আমিও ক্রিয়াবান পুরুষ। যজন, যাজন, বিবাহ, উপনয়ন দেওয়া এ সব আমি করে থাকি। তাছাড়া আমাকে একখানা চলন্ত সেতুও বলতে পারেন।

প্রকাশ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল, চলন্ত সেতু! তার মানে?

—আমি হলেম অবিবাহিত যুবক যুবতীদের মিলনের সেতু। তাদের মিলন ঘটানোও আমার একটা পেশা।

—ও; ঘটক?

—ঠিক ধরেছেন। আমি আপনার জন্য একটি পাত্রীর সন্ধান সত্বরই করে দিচ্ছি; এর মধ্যে কোন শ্রাদ্ধ বা বিয়ে হলে দয়া করে আমাকে জানাবেন।

—বেশ, দরকার হলেই খবর দেব। আপনি দয়া করে তরুণ-বাবুকে ডেকে দিন।

বৃদ্ধ ডাকলেন, তরুণ, ও তরুণ। আমার স্মরণ থাকবে আপনারা রাঢ়ী শ্রেণী, ভরদ্বাজ গোত্র।

তারপর প্রকাশের দিকে চেয়ে বললেন, দয়া করে আপনার ও আপনার অভিভাবকের নাম ঠিকানা বলুন আমি লিখে রাখছি।

এমন সময় নেপথ্যে শোনা গেল—সেলিব্রিটি হওয়া এক বিষম

বিপদ। খ্যাতির খেসারৎ দিতে হয় পদে পদে। গ্রীষ্মের দুপুরেও ঘুমোবার জো নেই।

পরিণয়ের সেতু এই খ্যাতিমানের উদ্দেশে বললেন, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—আসছি ক্রিয়ারত্ন কাকা।

বৃদ্ধ প্রকাশের দিকে চেয়ে বললেন, আমিই ক্রিয়ারত্ন, তার উপর শব্দশাস্ত্রী।

—আপনি যে সুপণ্ডিত তা আলাপেই বুঝেছি।

—বুঝবেন বইকি। ব্যাকরণ, সমাস, সন্ধি, কারক, তুদাদিগণ, গীতা চণ্ডী সব শাস্ত্রেই আমার অধিকাব আছে। তার উপর আমি দশকর্মান্বিত। তাই গুরুদেব উপাধি দিয়েছেন ক্রিয়ারত্ন। মূলত আমি হলেম শব্দশাস্ত্রী।

এই সময়ে রং-বেরং-এর লুঙি পরিহিত একটি লোক শব্দশাস্ত্রীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার গোঁফ ও দাড়ি পরিষ্কার কামানো, কানে পোড়া চুরুট, চোখে সদ্যনিদ্রোত্থিতের জড়তা। বয়স অনুমান করা মুশকিল, তবে চল্লিশ বিয়াল্লিশের বেশি হবে না।

প্রকাশ বুঝল, এই খ্যাতিমান ব্যক্তি। সে বলল, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙাবার জন্য মাফ করবেন।

লুঙি পরিহিত বলল, নেভার মাইণ্ড, ওটা আজকাল নিত্য-নৈমিত্তিক। এসেছি আজ তিনদিন, কাল পরিষদ থেকে খবর এল, পরশু সুনীতি চাটুজ্জে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপরই একটু হেসে—আমিই আপনাদের তরুণ চৌধুরী, ব্রাদার।

প্রকাশ বলল, আমি এসেছি প্রাচীন বাংলা পুঁথির সন্ধানে।

—তা অনেকেই এসে থাকেন, যাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁদেরই তরুণকে দরকার হয়। দেখলেন তো, ক্রিয়ারত্ন কাকা?

—সে তো প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করছি, ত্রিভঙ্গ।

তরুণ প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করল, কি বইয়ের দরকার আপনার ?

—পুরনো বাংলা উপন্যাস, হংসেশ্বর তর্কবাগীশের লেখা।

—ওঃ, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের বই ? তিনি ছিলেন দিগ্গজ সাহিত্যিক, জ্বলদর্চিতে নিশ্চয়ই আমার প্রবন্ধ পড়েছেন, বাংলার প্রাচীনতম ঔপন্যাসিক হংসেশ্বর, পড়েন নি ?

—এবার পড়ব।

ডাক্তার খাসনবিশ বলেছেন, প্রবন্ধ পড়ি আজকাল অনেক কিন্তু সমালোচকের তীক্ষ্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই না। তরুণ চৌধুরীর প্রবন্ধ এর ব্যতিক্রম। বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক প্র-পিতামহ হংসেশ্বরের রচনা শৈলীর দোষ ও গুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করে লেখক প্রমাণ করেছেন, হংসেশ্বর ছিলেন একজন সার্থক স্রষ্টা।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, বায়োকেমিক ডাক্তার খাসনবিশের কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ, তিনি একজন মস্ত বড় সাহিত্য রসিক।

ক্রিয়ারত্ন বললেন, তরুণ হচ্ছে জাত কেউটের বাচ্ছা; হংসেশ্বরের পুত্র জপেশ্বর, তার পুত্র ব্রজেশ্বর, তিনি ছিলেন মস্ত বড় চালানী কারবারের মালিক তার উপর ব্রজেশ্বর, ব্রজদা ছিলেন স্বভাব কবি। কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। ব্রজদার ছেলে ত্রিভঙ্গেশ্বর সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ খর্ব হলেও মাতৃভাষার চর্চার দ্বারা হংসেশ্বরের গৌরব অম্লান রেখেছে। একটা পুস্তক প্রকাশের ব্যবসাও খুলবে শুনেছি।

তরুণ বলল, সংস্কৃতেও নস্যাৎ নই। তবে বাংলা ও ইংরেজীতে বেশি মনঃসংযোগ করার ফলে সংস্কৃত ভাষাটা সাফার করেছে।

ক্রিয়ারত্ন বললেন, তা বটে।

তরুণ প্রকাশকে বলল, চলুন আমার ঘরে।

বৃদ্ধ আর এক কলকে তামাক সেজে ফুঁ দিচ্ছিলেন। প্রকাশ উঠলে তিনি বললেন, মনে রাখবেন কোন ক্রিয়াদিতে—

প্রকাশ বলল, নিশ্চয়।

—সাধু সাধু, ত্রিভঙ্গকে খবর দিলেই চলবে। দয়া করে আমার নাম মনে রাখবেন, পাতিরাম ক্রিয়ারত্ন শব্দশাস্ত্রী।

প্রকাশকে নিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে তরুণ বলল, বাজে বকা লোকটার অভ্যেস। দেখুন না, বারবার ত্রিভঙ্গ ত্রিভঙ্গ বলে ডাকবে। কেন বাবা, তরুণ বলে ডাকতে পার না ?

—আপনার নাম তা হলে তু'টো ?

—হ্যাঁ, ত্রিভঙ্গ পিতৃদত্ত, কিন্তু সাহিত্যের বাজারে ওটা অচল, তাই তরুণ নামটি বেছে নিয়েছি। পশ্চিমে আর একটা উঠানের দক্ষিণ সারিতে তরুণের ঘর। ঘরের সামনে জলচৌকির উপর আলপিন দিয়ে আঁটা কতকগুলি তুলট কাগজ শুকুচ্ছে।

তরুণ বলল, এগুলো হচ্ছে হংসেশ্বরের লেখা প্রাচীন পুঁথির হুবহু নকল। তু'শ বছর আগের লেখা, পাছে নষ্ট হয়ে যায় তাই কপি করিয়ে রাখছি।

তারপর ঘরের দিকে চেয়ে একটু গলা খাকারী দিয়ে বলল, তুমি একটু অন্য ঘরে যাও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি তরুণী বধূ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তরুণ বলল, বুঝতে পাচ্ছেন বোধ হয়, ইনি হচ্ছেন আমার হেঃ হেঃ, গৃহিণী সচিব সখী এবং প্রিয় শিষ্যা, ইনি উৎসাহ না দিলে সাহিত্য চর্চা আমার পক্ষে অসম্ভব হত।

তরুণের ঘরের চালার নীচে সবুজ একখানা কাপড় টাঙানো, একপাশে খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা, বেঞ্চির উপর রক্ষিত পাড়ের চাদরে ঢাকা তু'টি ট্রাঙ্ক, তার উপর ছোট একটি হাত বাক্স, আলনায় কয়েকখানি কাপড় ও শাড়ী ঝুলছে। পুবদিকে একটা আলমারীতে কতলগুলি বই পুতুল ও কাপড় চোপড়। পুরনো

খবরের কাগজে মোড়া মাটির দেওয়ালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল ও শরৎচন্দ্রের ছবি।

তরুণ প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে কি দেব, বার্মা সিগার না সিগারেট?

—কিছুই দরকার নেই।

কানের আধপোড়া চুরুটটা ধরাতে ধরাতে তরুণ বলল, এটা সাক্ষাৎ বিষ, কখনও খাবেন না। তবে আমি চুরুটটাকে নিবতে দেই, তাতে নিকোটিনের তীব্রতা অনেকটা কমে যায়। এ সব খবর ত কেউ একটা রাখে না।

প্রকাশ বলল, আমি বইয়ের সন্ধানে আরও একদিন এসেছিলাম।

—আমি কলকাতা পৌঁছেছি পরশু সকালে। দেশ থেকে বেরিয়েছি ক'দিন আগে। বার্নপুরে নামতে হল বঙ্কিম-শরৎ সাহিত্য চক্রে সভাপতিত্ব করতে। দুর্গাপুরে নামিয়ে নিয়ে গেল, সেখানে করতে হল দু' দু'টো বক্তৃতা। সেলিব্রিটি হওয়ার ঝামেলা ঢের। স্বর্গীয়···স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার বলতেন—আর যাই হও, সেলিব্রিটি হয়ো না তরুণ, ওতে শান্তি নেই।

প্রকাশ বলল, ঠিকই তো, সে ত দেখছিই।

—তা ঠিক, আপনিও বুঝি সেলিব্রিটি? আপনার লাইন?

—সেলিব্রিটি আমি মোটেই নই।

—সে আপনার সৌভাগ্য। আমায় বাধ্য হয়েই খ্যাতির মালা পড়তে হয়েছে। লোকে ধরে গলায় পরিয়ে দেয়। উপায় কি? জ্বলদর্চির সম্পাদক, মহাকালের ফিচার রাইটার, বিভিন্ন কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা। একজন পুরাতাত্ত্বিককে সেলিব্রিটি হতেই হবে।

—নিশ্চয়। আপনি সাহিত্যসেবা করছেন কতদিন?

তরুণ বিস্মিত ভাবে বললে, তাও জানেন না? মাই গড্। ছেলেবেলা হতেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অফিসে ও খ্যাতিমান

সাহিত্যিকদের বাড়ি যাতায়াত করতুম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে ছবি তুলতুম। শরৎচন্দ্র স্নেহ করতেন আর তারাশঙ্কর তো আমাদের হাতে গড়া '

—বাঃ আপনার রেকর্ড ত খুব উজ্জ্বল।

—ফানুসের নাম শুনেছেন নিশ্চয়। সিনেমার মাসিক পত্র ফানুস। কাটে বিশ হাজার। বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যিকার ব্যায়ামচর্চার অর্ধনগ্ন ছবিও বেরিয়েছে তাতে। টাকার বিনিময়ে অনেক ব্যায়াম ব্রতা মহিলা সাহিত্যিকও ছবি তুলতে দিয়েছেন। আমি ছিলুম ফানুস গোষ্ঠীর প্যাটেল, কংগ্রেসে যেমন সর্দার বল্লভভাই। যাক, তারও অনেক আগে দাঠাকুরের—অর্থাৎ শরৎদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বাজে শিবপুরে। সেখানে অনেকেই তাঁকে দাঠাকুর বলে ডাকত

—আপনার বয়স?

—অনুমান করুন।

—এই ধরুন চল্লিশ।

—চল্লিশ কি মশাই? ফরটি-এইট।

প্রকাশ বলল, হংসেশ্বরের কোন উপন্যাস আপনার কাছে আছে?

—সোল্ড ব্রাদার, অল্ সোল্ড; তবে নাটক, প্রহসন চম্পূকাব্য এখনও দু'একখানা করে আছে। কিন্তু উপন্যাসগুলো সবই বিক্রি হয়ে গেছে, রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ড কালেকটার রায়বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত লোকেরাই কিনেছেন। হাই সার্কেলে মুভ করাই আমার বিশেষত্ব কিনা!

প্রকাশ বলল, আমার দুর্ভাগ্য যে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হল।

তরুণ বলল, হংসেশ্বর ভিন্ন অন্য প্রাচীন লেখকের উপন্যাস আমার হাতে আছে।

—আমি চাই হংসেশ্বরের উপন্যাস।

—চাইবেনই তো। বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক তিনিই। পাবলিশার ও গবেষকদের কাছে হংসেশ্বর একটা 'ক্রেজ'—ওর বইখানা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্বিক বিষয়ে একখানা মূলবান দলিল। যাকে বলে ভ্যালুয়েবল্ হিস্টোরিকাল ডকুমেণ্ট।

একটু পরে প্রকাশ উঠতে চাইলে তরুণ বলল, আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি। বলেই সে ফ্রেমে বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত একটি কবিতা দিয়ে বলল, গুরুদেব নিজে আমায় পাঠিয়েছিলেন।

প্রকাশ কবিতাটি পড়তে লাগল।

তরুণ সেদিকে লক্ষ্য না করে বলতে লাগল, রবীন্দ্র প্রতিভার আমি একজন শ্রেষ্ঠ পূজারী। লোকে বলে কবি মণ্ডলের জ্যোতিষ্ক। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আমার সন্দর্ভ আছে। পড়েন নি? জ্বলদর্চিতে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। যা পড়ে কবিগুরু লিখেছিলেন··· বলেই তরুণ পড়তে আরম্ভ করল :

শ্রীমতী মৃত্তলিকা দেবী, কল্যাণীয়াসু—

প্রকাশ বিস্মিত ভাবে বলল, মৃত্তলিকা?

—ও যে আমার সাহিত্যিক উপনাম। যাকে বলে পেন নেম। ঐ নামেই আমার প্রথম দিকের লেখাগুলি বেরয়।

প্রকাশ বলল, সাহিত্যিক হিসাবে তাহলে আপনি শ্রীমতী মৃত্তলিকা।

—পেন নেম আছে আরও তু' একটা। তবে আপাতত তরুণই জেনে রাখুন! মৃত্তলিকা নামের একটা ইতিহাস আছে।

বিশ বছর আগেকর কথা। তখন আমি বার্নপুরে থাকি। সেখান্ থেকে কলকাতার কোন কাগজে একটা গল্প পাঠাই। ত্রিভঙ্গেশ্বর নাম দিয়ে। গল্পটি সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ যায়। মাস-

খানেক পরে সেই গল্প আবার পাঠালুম মৃত্তলিকা দেবী নাম দিয়ে। পরের সংখ্যায়ই লেখাটা ছাপা হল। সম্পাদক মনি অর্ডারে কুড়িটি টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

আমি কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। সম্পাদক বললেন, আমাদের খুব বোকা বানিয়েছেন ত? সেই থেকে ত্রিভঙ্গ নামটি বাতিল করেছি।

এইরূপ নানা কথাবার্তার মধ্যে তরুণ প্রকাশকে হংসেশ্বরের একখানা নাটক বা চম্পূকাব্য গছাবার চেষ্টা করল।

প্রকাশ বলল, আমি পরে একদিন আসব।

৬

সেইদিনই সন্ধ্যার একটু পরের কথা। 'খোকন, ও খোকন' বলে ডাকতে ডাকতে হলধর প্রকাশের পড়ার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন।

তার মনে হল কড়িকাঠ থেকে ঝুলনো অন্তত দুমণি একটা ভারী জিনিস তার দিকে ছুটে আসছে।

মস্তক রক্ষা করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে বৃদ্ধ মেঝেয় ঝুপ করে বসে পড়ে ডাকলেন, উট্রাম।

হলধরের প্রবেশ, মেঝেয় বসে পড়া, সবই ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে। একে ত অন্ধকার তার উপর প্রকাশ সাধকের নিষ্ঠা নিয়ে কড়িকাঠে—ঝুলনো রিং-এ দোল খাচ্ছিল, তাই মাতামহের উপস্থিতি লক্ষ্য করেনি। দোল খেতে খেতে সে ভাবছিল সিনেমার সুন্দরীর কথা। মেয়েরা অতিরিক্ত মেদবহুল পুরুষ পছন্দ করে না। প্রকাশের তাই এই উদগ্র প্রয়াস। এই দোল খাওয়া শুরু হয়েছে সেই স্মরণীয় রাত থেকে; সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ডন বৈঠক মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি আরও কতকগুলি ব্যায়াম।

হলধর আবার ডাকলেন, উট্রাম।

প্রকাশ বলল, কে, দাদু ?

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে হলধর বললেন, অলরাইট্...বলতে হয় যে তুমিই ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলছ !

গতিবেগ কমাতে কমাতে প্রকাশ বলল, এবার ব্রেক কষছি দাদু।

—হঠাৎ রিংএ ঝুলছ, ব্যাপার কি ?

প্রকাশ পাকা তালের মত মেঝেয় পড়ে গেল। সে আলোর সুইচ টিপে দিলে হলধর বললেন, একেবারে ঘর্মাক্ত কলেবর।

—মেয়েরা ফ্যাট্ পছন্দ করে না।

—নারীর মতানুযায়ী চলতে আরম্ভ করলে কবে থেকে ? তুমি তো ছিলে নারীদ্বেষী।

—সী ইজ ডিভাইন !

হলধর জিজ্ঞাসা করলেন, এই পটিয়সীটি কে ? যে তোমার মনে দাগ কেটেছে। কলেজের কোন ছাত্রী বুঝি ?

—আমি তাকে চিনি না।

—অল রাইট্। না চিনেই প্রেম, একেবারে আরব্যোপন্যাস !

একটু পরে রায়বাহাদুর আবার বললেন, যাক এত দিনে আমার উপযুক্ত নাতি হতে পেরেছ।

—তার মানে দাদু ?

—আমিও লভে পড়েছিলুম ভাই। তোমার দিদিমাকে দেখে ডিপ্ লভ হল। তার স্কুলের গাড়ী যে রাস্তা দিয়ে যেত আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

—চিনতে না তাঁকে ?

—আলাপ ছিল না তবে পরিচয় জানতুম।

—প্রথম প্রেমে পড়লে কবে ? সিনেমায় দেখে ?

—সিনেমা তখন কোথায় ? পল্লীগ্রামে মামাবাড়ী বেড়াতে গিয়েছি। থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন। মামাদের একপ্রতিবেশীর

বাড়ীতে দেখলুম এক পঞ্চদশী গাছের ডালে বসে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কাঁচা আম খাচ্ছে। দেখেই লভ হল।

—তাহলে অবস্থা আমার চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল বল। আমি ত পরিচয়ও জানি না।

—ওটা আরও বেশী রোমান্টিক। যত কৃচ্ছ্র সাধন, ফল ততই মিষ্টি।

—তোমায় কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছিল?

—হয়েছিল, তবে তোমার মতন নয়। তা যাক। আমার প্রেমে বাধা বিঘ্নের কথা শোন। আমার বাবা বললেন, ওরা কুলে খাটো, ওখানে বিয়ে হবে না। আর তোমার ভাবী দিদিমাটি সর্ত আরোপ করে বসলেন, বি, এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স পেতে হবে আমায়।

প্রকাশ বলল, পনর বছরের মেয়ে এই সর্ত দিলে? খুব ফরওয়ার্ড বলতে হবে ত।

—হবে না ফরওয়ার্ড। ক্লাশ টেনে পড়ছে তখন। তার আগে ছু ছুটো বৃত্তি পেয়েছে। প্রাইমারী আর মাইনারে। তাছাড়া, তখন পড়ছে কলকাতার বেথুন স্কুলে।

—তুমি কি করলে তখন?

—আমার বাবার এবং তোমার দিদিমার সর্ত আমাকে অকূল পাথারে ফেলে দিলে। জীবনে কোনো পরীক্ষায়ই ফার্ষ্ট ক্লাশ নম্বর পাইনি। তাতে আবার বি, এর ইংরাজী অনার্স। একবার ভেবেছিলাম একজামিনটা এক বছর পরে দেব কিন্তু বিলম্বও সহ্য হল না।

প্রেম কিন্তু অসাধ্য সাধন করল। চিরকালের আড্ডাধারী আমি দিনে ষোল ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। পরীক্ষায় হলাম ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট।

—জয়ী হলে ছুটোতেই?

—অল ফর লভ। জীবনের ধারাই গেল বদলে। ডেপুটিশিপ পরীক্ষায়ও ফার্ষ্ট হলাম। কেউ আশা করতে পারেনি হলধর এতটা করবে। উট্রাম।

উট্রাম ঘরে এলে হলধর বললেন, আজ রাত্রে খোকনবাবু আর আমি এক সঙ্গে খাব।

রাত্রে ডিনারের টেবিলে হলধর বললেন, আজ আমি তোমার প্রিয়তমার ও তোমার স্বাস্থ্য পান করব। একপেগ হুইস্কি আর এক পেগ ব্রাণ্ডি। তারপর তোমাদের মিলন ও মঙ্গল কামনায় ষ্ট্রং একটা ককটেল।

প্রকাশ বললে, আশীর্ব্বাদ করলেই যথেষ্ট হবে।

—ও সব সেকেলে কথা।

প্রকাশ বলল, জ্যোতিষী বলেছেন।

—অল রট। আবার জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মাত্রকেই বোগাশ মনে করি। ওদের কাউকে আসামীর ডকে পেলেই আমি জেলে পাঠাতাম।

—কিন্তু রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেছেন তার সন্ধান পাব।

—মেয়েটির ঠিকানা বলে দিলেন না কেন? তা হলে বুঝতাম, এ্যাস্ট্রলজি কিছুটা জানেন।

—ভৃগুলাঞ্ছন বলেন, রাস্তার রোড স্ট্রীট লেন প্রভৃতি ইংরাজী নামের সঙ্গে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের মিল করা অসম্ভব।

—ইউ আর এ ফুল। ঐ লাঞ্ছন তোমাকে বোকা বানিয়েছে। তাছাড়া তুমি না বলছিলে মোটরের নাম্বার নিতেও ভুল করেছ!

প্রকাশ নীরব।

হলধর বললেন, যাক, খোঁজ কর ভাই। আমার চেক বই সই করে তোমায় দিয়ে দেব। যত টাকা লাগে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

—উট্রাম, খোকনকে আর একটু মাংস পাঠিয়ে দাও আর দুখানা ফ্রাই। আমাকেও দুখানা। ড্রিঙ্কের সঙ্গে.........

বাবুর্চি মাংস ও ফ্রাই নিয়ে এলে হলধর হুকুম করলেন—ষ্ট্রং ককটেল আর দাদুর জন্য এক গ্লাস লিমন স্কোয়াস। দুটো ড্রিঙ্কে ঠোকা ঠুকি করতে হবে তো!

প্রকাশ বলল, দু দুবার স্বাস্থ্য পান ত হয়ে গেছে দাদু। ককটেল এখন থাক।

—নো নো, তোমাদের শুভ মিলন কামনার ড্রিঙ্কটা স্থগিত থাকতে পারে না।

উট্রাম ককটেল ও লিমন স্কোয়াস এনে দিতে প্রকাশের গ্লাসে গ্লাস ছুঁইয়ে রায় বাহাদুর বললেন, প্রকাশ ও তার অজানা প্রেমিকার শুভ মিলন কামনায় এই ককটেল। পানীয়টা এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেললেন তিনি। তারপর একসঙ্গে একখানা ফ্রাই মুখে পুরে দিলেন।

রায়বাহাদুরের চোখ লাল হয়েছে। মাথা একটু একটু টলছে। তিনি নাতিকে বললেন, ভুলে যেও না তুমি একজন গোয়েন্দা। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

—ভুলিনি, আজই গিয়েছিলাম তরুণ চৌধুরীর বাড়ীতে।

—কিছু খোঁজ পেলে?

চাকর বিশ্বনাথ এই সময় ট্রের উপর একখানা কার্ড নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রকাশ কার্ডখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল—

তরুণ চৌধুরী—সাহিত্যিক, সাংবাদিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সম্পাদক, (জ্বলদর্চি), কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য (বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন), ভূতপূর্ব কাঃ নিঃ সদস্য—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য-সেবক সমিতি, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মঙ্গল ভেরী (সদ্য লুপ্ত)।

হলধর বললেন, ভেতরে নিয়ে এস।

—অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলে এসেছি, রায় বাহাদুর!—বলে তরুণ চৌধুরী স্মিত হেসে ঘরে প্রবেশ করল।

তার মুখের মাঝখানে জ্বলন্ত বর্মা চুরুট, পরণে নতুন ধরনের কলার-তোলা ইস্ত্রি করা সার্ট। সার্টটা খুব সম্ভবতঃ লুঙ্গির কাপড়ের।

প্রকাশের দিকে চোখ পড়ায় সে বলল, নমস্কার, আপনি এখানে?

প্রকাশ প্রতি নমস্কার করল।

হলধর বললেন, এটি আমার দৌহিত্র, প্রফেসর প্রকাশ মুখোপাধ্যায়।

তরুণ বলল, আজ দুপুরেই ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। উনি আমার ওখানে হংসেশ্বরের উপন্যাসের খোঁজে গিয়েছিলেন। যাক—আমি এসেচি একখানা চিঠি দেখাতে। রুশ সাহিত্যিক নিকিটিন্ লিখেছেন।

—উত্তম। কিন্তু বিধিলিপি—অলৃরট্!

সেদিকে লক্ষ্য না করেই তরুণ বলল, আজকাল বাঙালীরা রুশ রাজনীতি, রুশ সাহিত্য নিয়ে পাগল। তাই স্থির করেচি—নিকিটিনের "সাইবেরিয়ান্ লাভ" নামক বিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ করব। তিনি অনুমতি পাঠিয়েছেন।

হলধর বললেন, নিকিটিনের নাম শুনেচি বলে তো মনে পড়েনা।

—মস্ত বড় লেখক। তাঁর "নেকড়ের ক্ষুধা"-ও একখানা বিখ্যাত বই। অবশ্য নাম না থাকলেও ক্ষতি ছিল না, বর্তমানে এদেশে রুশ নামেরই একটা মোহ আছে। শুনুন তবে একটা ঘটনা:

কোনো বিখ্যাত কাগজের সম্পাদক আমার নাম-করা গল্প 'লণ্ঠন' ফিরিয়ে দেন। আবার সেই কাগজেই লেখাটা পাঠিয়ে দিলাম—লেখার নীচে দিলাম—'ভরশিলভ' থেকে অনূদিত। পরের মাসেই লেখাটা বেরিয়ে গেল। দক্ষিণাও পেলাম।

হলধর বললেন, সম্পাদকগুলো অল্ রট্। থাক—আমি যে বিধিলিপির মাত্র ২২০ পাতা পেয়েছি! আমার উপর বিধি দেখচি বাম!

তরুণ বলল, আশ্চর্য! আমি ইন্সিওর করে ৫০০ পাতার বই পাঠিয়েচি।

হলধর বললেন, আমি পেয়েছি মাত্র ২২০ পাতা।

তরুণ বলল, ৫০০ পাতা ও ২২০ পাতার ইন্সিওর খরচাও তফাৎ আছে!

—তাহলে দেখচি অল্রট। চুরি হয়েছে এখান থেকে।

—কবে টের পেলেন?

যেদিন এসেছে তার পর দিন। পার্শেলটা কে খুলেছিল তাও আমার মনে নেই। সম্ভবত উট্রমই খুলে থাকবে। সে মদ খেলেও বিশ্বাসী লোক। পরের দিন ব্যাপারটা ধরা পড়ল।

তরুণ বলল, এতো ম্যাজিক্, রায়বাহাদুর!

ম্যাজিক নয়, অল্রট। নিশ্চয়ই কোনো গবেষকের কাজ! আই স্যাল সেণ্ড হিম টু জেইল। আমি তাকে জেলে দেব।

—যাক্—তোমার কি চাই, বিয়ার না হুইস্কি?

—বিয়ারই ভাল।

রায় বাহাদুরের হুকুমে বিয়ার এল। উট্রাম গেলাসে বিয়ার ঢালতে আরম্ভ করলে তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'চাবী'?

—হ্যাঁ।

চাবী মার্কা বিয়ারই আমার পছন্দ। কিং অব বিয়ার্স। আপনি কি পছন্দ করেন প্রফেসর মুখার্জি?

রায় বাহাদুর বললেন, ভায়া আমার টিটোটেলর। গান্ধী-আন্দোলনের সময় জন্ম কিনা!

—উনি খান না সেটা আনন্দের বিষয়। তবে গান্ধীজীর হোমরা চোমরা চেলারা প্রায় সকলেই সফট্ ওয়াইন বা হার্ড ওয়াইনের ভক্ত।

একটু পরে ফাউল রোষ্ট এলে তর্ক বাগীশের বংশধর সোৎসাহে তার সদ্ব্যবহার করতে লাগল।

রায় বাহাত্বর বললেন, তোমাকে এই বই এর অনুসন্ধান করতে হবে। প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকদের আমি চিনি না।

—আপনার আদেশ পালন করা তো আমার সৌভাগ্য।

—খরচ যা লাগে নিঃসঙ্কোচে চেয়ে নিও।

—না না, সে কি কথা। আপনি আমার পরম উপকারী পৃষ্ঠ পোষক।

বিয়ারের বোতলটা ততক্ষণে নিঃশেষ হয়ে গেছে। হলধর ডাকলেন, উট্রাম। উট্রাম আরও তুদিন তরুণকে দেখেছে। সে এবার তাই একসঙ্গে তু' তু'টা বোতল নিয়ে এলো। বোতলে বিয়ার ঢালতে ঢালতে বলল, আইস্‌ড বিয়ার।

আইস্‌ড বিয়ারই আমার পছন্দ, বললেন হলধর। জলের বদলে সাধারণত ঐটেই খেয়ে থাকি। ওতে হজম শক্তি ধীশক্তি তুইই বাড়ে।

উট্রাম একটু মুচকি হাসল।

খাওয়া শেষ হলে প্রকাশ উঠে গেল। হলধর ও তরুণ গল্প করতে লাগলেন। তুজনে এক একবার গেলাসে চুমুক দেন আর এক একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কি করে বিধিলিপির অপহৃত অংশ উদ্ধার করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হল অনেকক্ষণ। উভয়ের ধারণা এই চুরির পিছনে কোন মাথাওয়ালা লোক আছে।

তরুণ বলল, কোন সাহিত্য বাতিকগ্রস্তেরই এই কাজ।

—আই প্রটেস্ট, স্ট্রংলি প্রটেস্ট। বাতিকগ্রস্ত বল না তরুণ। তাহ'লে তুমি, আমিও ঐ পর্য্যায়ে পড়ে যাই।

—তা বটে, ক্ষমা করবেন রায় বাহাত্বর।

কথায় কথায় তরুণ বলল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আপনার বৌমা বললেন 'তোমার দাদার জন্য কিছু রসকলি নিয়ে যাও'।

—রসকলি ? বৌমা খুবই ভাল লোক। কিন্তু রসকলি জিনিসটা কি ?

—আমাদের পরিবারের একটা বিশিষ্ট খাবার। ফ্যামিলিটা পুরোন কি না, তাই, খাওয়া দাওয়া আচার ব্যবহার সকল বিষয়েই একটা বনেদী বিশেষত্ব আছে। রসকলি প্রথম ঔপন্যাসিক হংসেশ্বরের স্ত্রীর আবিষ্কার। সরভাজা আর সরপুরিয়ার কম্বিনেশন।

—উত্তম, কাল পরশু রসকলি নিয়ে এস। মেয়েদের তৈরী খাবার অনেকদিন খাই না। খোকার দিদিমা চলে যাওয়ার পর থেকে ঠাকুর চাকর বাটলারের দয়ার উপরই নির্ভর। অল্‌রট।

তরুণ বলল, কাঠগোলার রাজাকে একদিন দিয়েছিলুম, সেই থেকে তিনি প্রায়ই বলেন, কই আর রসকলি খাওয়ালে না ? যেমন তোমার লেখা তেমনি তোমার স্ত্রীর রসকলি দুইই পরম উপাদেয়।

হলধর বললেন, ঠিকই বলেছেন তিনি। বৌমাও দেখছি একটি ওয়াণ্ডারফুল লেডি। যাক্, সাহিত্যিক হিসাবে আমার কিছু খ্যাতি হয়েছে, ত্রিভঙ্গ ?

—ত্রিভঙ্গ !

—হেঃ হেঃ দুস্ক্রিয়ারত্ন না কে আছে তোমার বাড়ীতে ? খোকন তার কাছে শুনে এসেছে। যেতে দাও ও-সব। অল রট।

রায়বাহাদুর একটু থেমে আবার বললেন, আচ্ছা বাজারে আমার কি কিছু সাহিত্যিক খ্যাতি হয়েছে ?

—কোন্ বাজারের কথা বলছেন ?

—টেরিটি বাজার কিংবা চীনে বাজার নয়। বলছি কলেজ ষ্ট্রীট শ্যামাচরণদে ষ্ট্রীট ও বঙ্কিম চাটুজ্জে গলির কথা। রোজ সন্ধ্যায় যেখানে সাহিত্যিকরা চরে বেড়ায়।

—হচ্ছে ধীরে ধীরে।

—আমার জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস পড়ে বোধ হয় পাঠকরা মুগ্ধ হয়েছে।

—ঠিক বলেছেন, না হয়ে উপায় কি ? হতেই হবে মুগ্ধ।

প্রকাশ বলছিল আমার মোশ্লেম বৈষ্ণব কবি নাকি খুব উঁচু দরের লেখা।

—হ্যাঁ, উনি আপনার উপযুক্ত দৌহিত্র।

হলধর বললেন, ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এম. এ, সাকসেসফুল প্রফেসর।

তরুণ বলল, তাছাড়া সাহিত্য রসিক।

সে ভাবছিল তাকে সন্দেহ ক'রে হলধর বোধহয় নাতিকে তার বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন। তার মনে হল, যে উদ্দেশ্যে সে এসেছে তা আজ আর প্রকাশ না করাই ভাল। কিন্তু টাকারও তো দরকার। ক্রিয়ারত্ন ঘর ভাড়ার জন্য যা ঘন ঘন তাগিদ দিচ্ছেন।

রায় বাহাদুর বললেন, কি ভাবছ তরুণ ? আউট উইথ ইট।

—ডাক্তার বললেন, আপনার বৌমাকে টনিক খাওয়াতে—

—হ্যা হ্যা, টনিক খাওয়ান ভাল।

—দাম বড্ড বেশী

—তার জন্য ভেব না।

—আমার প্রতি আপনার স্নেহ অপরিসীম।

—হবেই তো। বাংলার আদি ঔপন্যাসিকের বংশধর, তুমি নিজেও একজন সাহিত্যরসিক, আমার সমগোত্র।

—টনিকের কত দাম ?

—সাড়ে ন' টাকা বোতল।

—তরুণ।

—আজ্ঞে।

—তুমি গোয়েন্দা—

তরুণ হলধরের মুখের দিকে তাকাল।

—আমি তোমায় নিযুক্ত করছি।

—আমার সৌভাগ্য।

হলধর বললেন, বিধিলিপি সম্বন্ধে।

তরুণ দেখল তার অনুমান মিথ্যা। সন্দেহ থাকলে তিনি তাকে গোয়েন্দা গিরিতে নিযুক্ত করতেন না।

সে বলল, নিশ্চয় করব। বিধিলিপি আমার পূর্ব-পুরুষের রচনা। তিনি ছিলেন একটা জিনিয়াস। আজ দু'শ বছর পরে অপর একজন জিনিয়াস তাকে বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরার ভার নিয়েছেন।

হলধর বললেন, ভেবেছিলুম বের করব একটা এ্যানোটেটেড্ এডিশন্, নিজে ভূমিকা লিখব। কিন্তু সাহিত্য তস্করর। সব ভণ্ডুল করে দিল।

তারপরই হলধর উট্রামকে হুকুম করলেন, তরুণবাবুকে কুড়িটে টাকা দিয়ে দাও।

—যে আজ্ঞে!

—বৌমাকে রীতিমত টনিক খাওয়াবে তরুণ।

—আপনার অনুগ্রহে।

—অল রট্। অনুগ্রহ আবার কি? সাহিত্য বল, হাকিমী বল, ঘরে স্ত্রী না থাকলে—"অরণ্যং তেন গন্তব্যং"।

৭

চোরবাগানে কোনো ধনী গৃহের দোতালায় মেয়ে মহল-এর বার্ষিক উৎসব।

সাজঘরে প্রতিমা বসন্ত সাজছিল আর ক্ষিতীশের বোন দীপা পরছিল শীতের পোষাক।

বাহুতে কিশালয়ের বলয় পরতে পরতে একটু দূরে প্রকাশের দিকে চেয়ে প্রতিমা দীপাকে বলল, এই তোমার প্রকাশ মুখুজ্যে? ইংরেজীর প্রফেসর?

দীপা বলল, কেন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

—হচ্ছে বৈ কি! মাথায় যে বিরাট টিকির বহর, তাতে ভদ্রলোক টুলো পণ্ডিত না হয়ে যায় না!

ক্ষিতীশের পরামর্শে প্রকাশ আজ আবার গলাবন্ধ জিনের কোট পরেছে। মাথায় আগের মত কদম-ছাঁটা চুল। টিকিটাও বেশ স্ফীত হয়েছে।

ভৃগুলাঞ্জনও তাকে বলেছেন, আপনার বন্ধুর কথাই ঠিক। সাজগোজের এই প্রাচীনত্বের মধ্য দিয়েই একটি আধুনিকার চিত্ত জয় করা সহজ!

তাছাড়া প্রকাশ মাতুলী, তাবিজ কবজও পরেছে অনেক। প্রেম বৈতরণী কবচ, সর্ব-সিদ্ধি তাবিজ, চিত্ত চকোর মাতুলী—সবই ভৃগু লাঞ্ছনের দেওয়া। এজন্য তিনি টাকা নিয়েছেন দু'শর উপর।

দীপার অনুরোধে আজ প্রকাশ এখানে এসেছে মেয়েদের সভায় সভাপতিত্ব করতে। প্রথমে সে আপত্তি করেছিল অনেক, কিন্তু দীপা বলে—আমি তাঁদের কথা দিয়েছি প্রকাশ দা।

—আমার নাম উঠল কি করে?

—উঠবে না কেন? ছাত্র-ছাত্রী মহলে অনেকেই তোমার নাম জানে। শুধু তো ভাল প্রফেসর হিসেবে নয়, বক্তা হিসেবেও তুমি বেশ নাম কিনেছ।

প্রকাশ একটু খুসী হয়ে বলল, তাই নাকি? আমি তো জানতুম না!

সভ্যরা প্রায় সকলেই কলেজের ছাত্রী, তারা একজন প্রফেসরকে সভাপতি করতে চায়। দীপা প্রকাশের নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদিকা অমিয়া দেবী বললেন, খুবই ভাল কথা। তিনি সভাপতি হ'লে সবাই খুসী হবে।

সভা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে মায়া সেন রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সভার উদ্বোধন করলেন। লেখা হাল্দার করল আবৃত্তি। এর পর হবে নাচ,—'শীতের প্রয়ান ও বসন্তের আগমনী'।

প্রতিমা সাজঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে প্রকাশকে আরো ভাল ক'রে দেখে নিয়ে দীপাকে ডেকে বলল, ভাই, তোমার এ

সভাপতিকে কোথায় যেন দেখেচি। জিনের গলাবন্ধ কোট, টিকি ও কদমছাটা চুলের বৈশিষ্ট্যের জন্যই ওঁকে মনে আছে।

দীপা বলল, দেখেছ ? কোথায় ?

—সিনেমায়।

—তাই নাকি ? মাঝখানে কিন্তু উনিও আদ্দির পাঞ্জাবী ধরেছিলেন, হাল্ ফ্যাসনে চুল ছাঁটতেন, আর টিকিটাও তখন খুব ছোট হ'য়ে গিয়েছিল।

—কেন ?

দীপা বলল, সিনেমায় কোন এক সুন্দরীকে দেখে। হয়ত সে-ই আমাদের প্রতিমা চক্রবর্তী।

প্রতিমা একটু হেসে বলল, যত সব বাজে কথা থাক্, লোকটি কিন্তু ভাই বেশ অদ্ভুত। ইংরেজীর প্রফেসর, অথচ সাজ-পোষাকে টুলো পণ্ডিতের মত। তাছাড়া, কোটের উপর থেকে গলায় ঝুলনো একটা মাদুলিও দেখা যাচ্ছে।

দীপা বলল,হয়ত মাদুলী ধারণ করেছেন সেই সুন্দরীকে পাওয়ার জন্যই। আর শুনেচি, এক্ছারসাইজও শুরুকরেছেন ঐ একই উদ্দেশ্যে।

—তার মানে ?

—মেয়েরা ফ্যাট পছন্দ করে না, সেই জন্য।

এই সময় আবৃত্তির আনুষঙ্গিক করতালি শেষ হ'লে সভাপতি কার্য্যসূচী দেখে ঘোষণা করলেন, নৃত্য—'বসন্তের আগমনী'।— শ্রীমতি প্রতিমা চক্রবর্তী ও দীপা সেন।

প্রতিমা আয়নায় নিজের মুখ দেখে, কপালের চুলগুলো একটু সরিয়ে দিল। খোঁপায় গুজল ক'টা ফুল।

বাদ্যের তালে প্রথম প্রবেশ করল শীত,—অঙ্গাবরণ শুভ্র, মাথায় শুকনো ফুল ও ঝরা পাতার করোনেট্।

আজ তার বিদায়ের দিনে পাতাগুলি এক-একটি করে ঝরে পড়েছে। শীত ধরেছে ঝরা পাতার গান।

মায়া সেন গাইছেন নেপথ্য সঙ্গীত। মৃদু আলোক সম্পাতে আর বেহালার করুণ সুরে শীতের বিদায় মর্মস্পর্শী হ'য়ে উঠল।

এর পরই ঘরখানা সবুজ আলোয় ভ'রে গেল। মায়া সেন ধরলেন—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুঠাম দেহ খানিকে নব-পল্লবিত লতার মতন দুলিয়ে দুলিয়ে প্রতিমা মঞ্চে প্রবেশ করল। সকলেই তার গৌরবজ্জ্বল কান্তি, অনুপম মুখশ্রী ও লীলায়িত দেহভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হ'ল। সবচেয়ে বিমোহিত হলেন সভাপতি স্বয়ং।

প্রকাশ নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। সেই সুন্দরী আজ বসন্তবেশে! একি স্বপ্ন না মায়া।

প্রতিমার দিকে সে অপলক নেত্রে চেয়ে রইল। প্রতিমা নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে তার শান্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি প্রকাশের চোখের উপর তুলে ধরল।

প্রকাশের বুকে আরম্ভ হ'ল দ্রুত স্পন্দন। মাথাটা ঝিমঝিম্ করতে লাগল। এতটা সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না সে!

কিছুক্ষণ পরে ফাল্গুনের আগুনে রঙীন হ'য়ে উঠল মেয়ে মহলের এই উৎসব। আলোক-শিল্পী এবার করলেন অরুণ-আলোক সম্পাত। আর মায়া ধরলেন—'আগুন লেগেছে বনে বনে'।

এরই জন্য প্রকাশ ক'মাস সিনেমায় সিনেমায় ঘুরেছে! মেয়েদের প্রত্যেকটি নাচের ও জলসার টিকিট কিনেছে, দেখেছে 'শ্যামা ও চণ্ডালিকা'। ট্যাক্সিতেই বা খরচ করেছে কত!

সার্থক নাম প্রতিমা। রমেশ পালের গড়া দুর্গা-প্রতিমার চেয়েও সুন্দর! বাঙালী বামুনের মেয়ে সে, যোগাযোগ শুভ! ফুটপাথে বসলে কি হবে, ভৃগুলাঞ্ছন একটা জিনিয়স্। তিনি সত্যই বলেছিলেন, প্রেম বৈতরণী ধারণ করুন। এক মাসের মধ্যেই নদী পেরিয়ে যাবেন। হলও তাই। তিনি আরো বলেছিলেন, চিত্ত-চকোর মাদুলী সুন্দরীর চোখে পড়লে তিনিও মুহূর্তেই মুগ্ধ হবেন।

কথাটা মনে পড়ায় প্রকাশ কোটের উপরের-বোতামটা খুলে দিয়ে চিত্ত-চকোরকে বুকের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিল।

তিন তিন খানা গানের পর প্রতিমা মঞ্চ ত্যাগ করলে, প্রকাশ আপন মনে গুন্ গুন্ করতে লাগল,—'আজু মঝু শুভদিন ভেলা'।

আরো কয়েকটি নাচ ও গান হ'ল। 'মেয়ে মহলের' সাম্পাদিকা কার্য্যবিবরণী পাঠ করলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছ'তিনজন ভাষণ দিলেন।

প্রকাশ সে-সব কিছু বিশেষ লক্ষ্য করেনি। এবার সম্পাদিকা তাকে বললেন, এখন আপনার ভাষণ।

—এ্যাঁ, আমায় বলতে হবে ?

মনে হ'ল, সভাপতি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছেন!

প্রকাশের পাশেই এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। তিনি বললেন, ঐটি আমার মেয়ে।

—কোন্‌টি ?

—বসন্ত।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! 'বসন্ত'—অর্থাৎ প্রতিমা এঁরই মেয়ে! মেয়েটি প্রভাতের আলোর চেয়েও সুন্দর আর তার বাবা মোটা-সোটা এই ভদ্র লোক। উঁচু কপালের মধ্যে নিষ্প্রভ কোঠরগত ছ'টি চোখ, দেখলে লরেল্ ও হার্ডী-যুগলের লরেলের কথা মনে পড়ে।

ভদ্রলোক বললেন, প্রতিমা এবার ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছে।

প্রকাশ বলল, ওয়াণ্ডারফুল! আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।

বৃদ্ধ হেসে বললেন, অনেকেই তা বলে বটে।

—বলতে তারা বাধ্য মিঃ সান্যাল। মেয়েটি নাচ-গানে আন্‌প্যারালাল।

—আমি সান্যাল নই, চক্রবর্তী। দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমি হাইকোর্টের একজন এ্যাডভোকেট্ ও গবেষক।

'মেয়ে মহলের' সম্পাদিকা আগেই দেবেন বাবুর সঙ্গে প্রকাশের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

নিজের ভুলের জন্য লজ্জিত হ'য়ে সে বলল, ক্ষমা করবেন চক্রবত মশাই।

—রাইটও। সকলেরই ওরকম হ'য়ে থাকে।—ব'লে দেবেন্দ্র নাথ সভাপতির পদ-গৌরব ভুলে তার পিঠ চাপড়াতে আরম্ভ করলেন।

প্রতিমার পিতার এই আপ্যায়নে পরিতোষ লাভ ক'রে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, আপনার গবেষণার বিষয় কি ?

—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য-সাহিত্য।

সভ্যগণ ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠছে দেখে সম্পাদিকা সভাপতিকে তাগিদ দিল—আপনি এবার কিছু বলুন।

প্রকাশ সভাপতিত্ব করতে বেশ অভ্যস্ত। বক্তৃতাও ভালই করে। কিন্তু আজ সে দাঁড়িয়েই কয়েকবার ঢোক গিলল, কপালের ঘাম মুছল। তারপর চিত্ত-চকোর মাদুলী ধ'রে নাড়তে লাগল।

দীপা প্রতিমাকে বলল, দেখেচ, সভাপতি কেমন নার্ভাস হয়ে গেছে।

প্রকাশ আরম্ভ ক-—

মহিলাগণ ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি অপেক্ষা অনেক যোগ্য ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। যেমন—পূজনীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এ্যাডভোকেট ও গবেষক মহাশয়। তিনি সভাপতিত্ব করলেই সর্বাংশে শোভন হ'ত। আমি নিজের অযোগ্যতার জন্যে লজ্জিত। আমাকে এই ভাবে সম্মানিত করায় আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজ আমার একটা স্মরণীয় দিন—সর্বাপেক্ষা শুভদিন বললেও অত্যুক্তি হবে না।

সভাপতি এই সময় প্রতিমার দিকে তাকালেন।

কোটের বোতামের উপর তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘোরাতে ঘোরাতে প্রকাশ আগেই একটা বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছিল। দীপা প্রতিমার কানে কানে বলল, প্রেসিডেন্ট এবার আর একটা বোতাম ছিড়বে দেখচি!

প্রতিমা একটু হাসল।

সভাপতির অভিভাষণ চলতে লাগল—

ভবিষ্যতের জননীদের স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার উপর দেশের উন্নতি নির্ভর করে। সেদিক থেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উপযোগীতা খুব বেশী। আপনাদের বার্ষিক বিবরণী শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে এর দ্বারা সমাজের ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। আপনারা অনেক কাজেই হাত দিয়েছেন। যেমন—বিতর্ক-সভা, স্বাস্থ্যোন্নতি শাখা, রন্ধন সেক্‌শন্। ঝিনুকের বোতাম তৈরী এবং সেলাইয়ের কাজ করে মেয়ে মহলের কিছু আয়ও হয়েছে। এটা সুখের বিষয়। আপনাদের দ্বারা কুটির-শিল্পের প্রচলন ও উন্নতি হোক—এই প্রার্থনা।

এই সব কাজের জন্য মেয়ে-মহলের কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি—সবই হয়েছে চিত্তাকর্ষক।

সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে 'বসন্তের আগমনী'। কুমারী প্রতিমা যে নৃত্য কুশলতা দেখিয়েছেন তা অপূর্ব তাঁর কণ্ঠস্বর অনবদ্য, ভঙ্গী অপ্রতিম।

প্রতিমাকে জিনিয়স্ বলা চলে। আমি সভার পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সময় সদস্যারা করতালি দিল। সবার উপরে উঠল দেবেন বাবুর করতালির শব্দ।

প্রকাশও তাদের সঙ্গে যোগ দিল!

দীপা প্রতিমাকে বলল, সভাপতি তোমার কণ্ঠস্বর টের পেল কি ক'রে?

সভাপতি ঘোষণা করলেন—কুমারী প্রতিমার উজ্জ্বল প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে একটা স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

শ্রোতৃগণের মধ্য থেকে দু'তিনজন সমস্বরে প্রশ্ন করল, দাতার নাম জানতে পারি কি ?

প্রকাশ বিপদে পড়ল। পদকের কথা কেউ তাকে বলেনি। সভাপতি হ'লেও তার বয়স এত কম যে, নিজে থেকে একটা পুরস্কার ঘোষণা করাও অশোভন।

সম্পাদিকা সমস্যার সমাধান করে দিলেন,—পুরস্কার দেবেন পরিচালক সঙ্গ।

পরিচালক সঙ্ঘের সদস্যরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

দীপা প্রতিমাকে বলল, তোর গলায় সভাপতির দেওয়া মেডেল ঝুলবে দেখছি।

প্রতিমা বলল, ইস্!

সভাভঙ্গের একটু পরে জলযোগান্তে দেবেনবাবু বিদায় নিলেন। সঙ্গে প্রতিমা। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রকাশও তাদের গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার হাতল ধরে সে প্রতিমার দিকে চেয়ে তার নৃত্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আরম্ভ করল—আপনার প্রতিভায় সকলে চমৎকৃত হয়েছে, মিস্ চক্রবর্তী!

সভার পরিচালকদের মধ্যে যারা গাড়ী পর্যন্ত এসেছিলেন তারা অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন।

দেবেনবাবু ও প্রকাশ—উভয়েরই উৎসাহের সীমা নেই। একজন প্রশংসা করেই কৃতার্থ, আর একজন কন্যার প্রশংসা শুনে ভুলে গেছেন যে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা তাঁর পক্ষে একান্ত দরকার! কিন্তু প্রতিমা ভোলেনি। সে পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিল—রাত হয়ে গিয়েছে, চল বাবা।

প্রকাশের মনে হল কী সুন্দর কণ্ঠস্বর।

আচ্ছা, মা চল—দেবেনবাবু বললেন। তার পর প্রকাশের উদ্দশ্যে বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন আমার ওখানে, সাহিত্য আলোচনা করা যাবে।

প্রকাশ বলল, সেত পরম সৌভাগ্য! আপনার ঠিকানা—

ব্লক কিউ প্লট ৯৫৬ ডি, নিউ আলীপুর। আপনি গেলে বড়ই সুখী হব। অনেক রিসার্চ্চ করেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে। সেগুলি আপনাকে দেখাতে চাই।

প্রকাশ বলল, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আমারও খুব অনুরাগ। "তোমার চরণে আমার পরাণে পড়িল প্রেমের ফাঁসী" সুপার্ব প্রেমের একরকম সিনসীয়ার কবিতা বিশ্ব সাহিত্যে দুর্লভ।

দেবেনবাবু প্রশ্ন করলেন, আসছেন কবে?

—কাল মর্ণিংয়েই যেতে পারি; আপনার ঠিকানা?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, পণ্ডিতদের অবশ্য এ রকম হয়ে থাকে। আমারই মাঝে মাঝে হয়।

—আমাদের ঠিকানাটা যেন কি? বলে দেবেন বাবু মেয়ের দিকে তাকালেন।

প্রতিমা একটু হেসে বলল, ব্লক কিউ ৯৫৬ ডি, নিউ আলীপুর।

প্রকাশ সাগ্রহে প্রশ্ন করল নিউ আলীপুরত'?

প্রতিমা একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, কাল আপনি মর্ণিংয়েই আসবেন। সকালে পড়াশুনো করি। বাবা আর আপনি নর্ঝ্ণাটে সাহিত্য আলোচনা করতে পারবেন।

এই সংবাদে প্রকাশ মোটেই খুসী হতে পারল না।

বিদায় নেওয়ার সময় দেবেন বাবু বললেন, আপনার অভিভাষণ হয়েছে খুব সারগর্ভ। কোন কাগজে বেরুবে?

মেয়ে মহলের সম্পাদিকা আমিয়াদেবী বললেন, বিস্তৃত বিবরণ সব কাগজেই পাঠাবো। আশা করি তারা রিপোর্টটি পুরোপুরিই ছাপাবে।

দেবেনবাবু সম্পাদিকার দিকে চেয়ে বললেন, রিপোর্টে আর্টিষ্টদের নাম ত' থাকবে, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামও থাকবে আশা করি।

—হ্যাঁ, কাগজে ফুল রিপোর্ট, পাঠাব।

দেবেনবাবু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রকাশ বাবুকে তাহলে কাল বিকালেই আসতে বলি? তোমার কি কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?

প্রতিমা বলল, এসপ্তাহে রোজই আমার নাচের রিয়ার্সাল আছে। বলেই প্রকাশের দিকে চেয়ে দেখল তার মুখে আষাঢ়ের মেঘ নেমেছে। একটি তরুণের মনে এরূপ বেদনার সঞ্চার করতে পেরে আর পাঁচটি তরুণীর মত সেও বেশ কৌতুক মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করল।

দেবেনবাবুর গাড়ী চলে যেতে প্রকাশ উপস্থিত সভ্যদের বিস্মিত করে ছুটে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু তাদের চেয়েও বেশী বিস্মিত হলেন ভিতরের লোকেরা।

সভাপতির কি অদ্ভুত লম্ফন শক্তি! এক এক লাফে তিন তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে যা । তিনি তখন ভুলে গেছেন তার দেহের ওজন আর পদের গাম্ভীর্য—দুই-ই।

যাঁরা সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামা করছিলেন তারা সন্তর্পণে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

প্রকাশ উপরে উঠে দেখল ক্ষিতীশ বড় একখানা খাস্তা কচুরী মুখে পুরে দিচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সে ডাকল, ক্ষিতু?

ক্ষিতীশের পক্ষে কথা বলা তখন নিরাপদ নয়। সে জিজ্ঞাসু নেত্রে বন্ধুর দিকে তাকাল।

প্রকাশ বলল, আগুণ লেগেছে বনে বনে।

ক্ষিতীশ মুখের কচুরীখানা গলাধঃকরণ করে বলল, আগুনের আঁচটা অনেকেই টের পেয়েছে।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে প্রকাশ বলল, ষ্টুপেণ্ডাস্।

ক্ষিতীশ বলল, ষ্টুপেণ্ডাস্ মানে?

এই সময় দীপার বন্ধু বিজলী সভাপতির জন্য এক প্লেট খাবার নিয়ে এল। প্রকাশ খেতে আপত্তি করলে সে ঘাড় একটু বাঁকিয়ে স্মিতমুখে বলল, না, না বললে শুনবো না—

প্লেটের উপর বিজলীর উপর এমনকি দীপার উপর ও প্রকাশের রাগ হ'লো। এরা তার মনের আবেগ প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করছে। কিন্তু উপায় কি? এটা হল সভাপতিত্বের শাস্তি। তরুণের ভাষায় বলতে গেলে সেলিব্রিটি হওয়ার বিপদ। একখানা সন্দেশ তুলে নিয়ে সে বলল, আর নয়, মাফ্ করবেন! তারপর ক্ষিতীশকে বারান্দার এক প্রান্তে টেনে এনে এদিক ওদিক চেয়ে বলল, সি ইজ দি লাইট অফ ক্যালকাটা।

—কে?

—প্রতিমা—বসন্ত।

ক্ষিতীশ হেসে বলল, সিনেমার সেই মেয়েটিকে এরই মধ্যে ভুলে গেলে!

—ভুলিনি, ভুলব কেন? এই সেই।

—ঠিকত?

—আলবৎ, তাকে ভুল করব?

—কনগ্রাচুলেশনস্

—চল ঐ ঘরে, এখনই একটা প্লান করা দরকার।

—প্ল্যান সোজা। তুমি বামুনের ছেলে সুপ্যাত্র অবস্থা ভাল, সেও সম্ভ্রান্ত বামুনের মেয়ে। একটি ঘটকী পাঠাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কথাটা মন্দ নয়। আরও সুখবর প্রতিমার বাবার সঙ্গে

আলাপ হল, ভারী ভদ্রলোক তিনি। আমাকে তাঁদের বাড়ি যেতে বলেছেন, ঠিকানাও দিয়েছেন।

—জোর বরাত দেখছি, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই নিমন্ত্রণলাভ। কিন্তু ঠিকানা ভুল করনিত ?

—না।

—তা হলে কালই যাও।

—সে গুড়ে বালি। সকালে সে পড়ায় ব্যস্ত থাকে, বিকেলে এক হপ্তা নাচের মহড়া।

—তা হলে দেরী কর এক হপ্তা।

—কিন্তু কালই একবার ভাগ্য পরীক্ষা করব। জ্যোতিষীর কাছে জিজ্ঞাসা করে কাল বিকালেই যাব ভবছি। ভৃগুলাঞ্ছন সত্যিই একটা হাইক্লাশ জ্যোতিষী।

ক্ষিতীশ বলল, আব তার কবচ তাবিজও বেশ জোরালো দেখছি। গোমেদ, বেড়েলা মূল, উনুনের ছাই অনেক কিছুই ত ধারণ করেছ তুমি।

প্রকাশ বলল, প্রেমের পথে ভাই বিঘ্ন অনেক। সেগুলো কাটাবার জন্যই ভৃগুলাঞ্ছন ঐ সব দিয়েছেন। যাক দেখলেত প্রতিমাকে ? ৎ ন সাক্ষাৎ—

ক্ষিতীশ বলল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দুর্গা কালী শীতলা।

—তুমি বড় বাজে বক।

—যাক চিনেছত ওকে ?

—হাঁ, দেখেছি দীপার সঙ্গে।

—ক্ষিতীশ— !

—প্রকাশ— !

প্রকাশ বলল, তুমি এখনও প্রেমে পড়নি ?

—না পড়িনি, তবে এবার চেষ্টা করে দেখব।

এই সময় দীপা এসে উপস্থিত। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল তাকে,

প্রতিমা কি তোমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড.?

দীপা বলল, হ্যা।

প্রকাশ বলল, বেশ ক্লাবটি করেছ তোমরা। তোমাদের নাচগান উঁচু দরের হয়েছে। বিশেষ করে তোমার ও প্রতিমার।

দীপা বলল, কই সভাপতির অভিভাষণে আমার নাম করেন নিত?

—এঁ্যা, করিনি নাকি? বড় ভুল হয়ে গেছে ত! যাক, দেবেন বাবুকে তুমি চেন?

—হ্যা, চিনি।

—আলাপ হয়ে ভারী খুসী হলাম। মানী লোক, আত্মভোলা মানুষ, সাহিত্য নিয়েই থাকেন।

গাড়ীতে চড়ে প্রকাশ ড্রাইভারকে বলল, বিলায়তি চক্কর।

সীমাবদ্ধ বাড়ীতে আনন্দ রাখার স্থান নেই, প্রকাশ তাই গড়ের মাঠে গঙ্গাতীরে ছুটে চলেছে।

আকাশ ভরা চাঁদের আলো মাঠে; গাছের পাতায় গঙ্গার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে তার স্নিগ্ধ সুষমা। প্রকাশের আনন্দে আজ প্রকৃতি যেন ধরেছে এই মনোহর রূপ।

প্রকাশ গুণ গুণ করতে লাগল—আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

পরদিন দুপুরে প্রকাশকে বিরাট মোটর গাড়ী থেকে নামতে দেখে ভৃগুলাঞ্ছন শশব্যস্তে আসন ছেড়ে গাড়ীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আগচ্ছতুঃ ভবান্, শুভমস্তু। খবর ভালতো?

প্রকাশ তাকে নমস্কার করে বলল, আপনি একজন এ্যাস্ট্রল-জিক্যাল জিনিয়স। আপনার দয়ায় তার সন্ধান পেয়েছি। শুধু সন্ধান নয়, নিমন্ত্রিতও হয়েচি তাদের বাড়ীতে।

—ওতে আমার কৃতিত্ব খুবই কম, হয়েছে দ্রব্যগুণে। মন্ত্রঃপূত

উনুনের ছাই, বেড়েলার মূল আর গোমেদের শক্তি অদ্ভুত। তার উপর চোলাই লামার ও ভৃগু-মন্ত্রের প্রভাবও পড়েছে যথেষ্ট।

ভৃগুলাঞ্ছন ফিরে এসে ফুটপাথের উপর নিজের আসন গ্রহণ করলেন, প্রকাশের জন্য আর একখানা ছোট্ট মাদুরের ওপর বিছিয়ে দিলেন পাড়ের আসন। প্রকাশ বলল, কিন্তু আপনাকে একটা প্রতিবন্ধকের সুরাহা করে দিতে হবে।

—প্রতিবন্ধক !

—হ্যাঁ, প্রতিমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়েচি বটে, কিন্তু সেখানে গেলেও তাকে এখন পাওয়া যাবে না। সকালে পড়া করে, বিকালে যায় নৃত্য-নাট্যের মহড়া দিতে। এই রিহার্সাল চলবে এখন এক সপ্তাহ।

ভৃগুলাঞ্ছন চোখ বুঝে কর গুণে জপ করতে লাগলেন! ঠোট একটু কাঁপছে, তার ফাঁক দিয়ে দু একটা অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছে —রিং ফট্ ক্লিং। মিনিট তিন চার কাটল এইভাবে। প্রকাশ অপলক দৃষ্টিতে চোলাইলামার শিষ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে জ্যোতিষীর মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা। তিনি বললেন, আজই রাত আটটার সময় আপনি যান, দেখা হবে নিশ্চয়।

—ঠিক তো ?

—চোলাই লামা ও ভৃগু-শিষ্যের গণনা মিথ্যা হয় না। তবে, তার জন্য কিছুটা ক্রিয়া করা দরকার।

—কি ক্রিয়া ?

—সন্ধ্যার সময় বশীকরণ জপে বসব। জপের অলক্ষ্য ও দুর্বার শক্তি শ্রীমতিকে বাড়ীতে টেনে নিয়ে আসবে।

—আপনার ক্ষমতা অদ্ভুত। খরচা কত পড়বে ?

—বেশী নয়। দ্রব্য মূল্য, দক্ষিণা ইত্যাদি বাবদ মোট ১৯৲ সোয়া পাঁচআনা।

প্রকাশ সঙ্গে সঙ্গেই দুখানা দশটাকার নোট বা'র ক'রে দেয়। জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীমতির নাম যেন কি?

—প্রতিমা চক্রবর্ত্তী।

—চমৎকার মিল। প্রকাশ ও প্রতিমা—ব'লে জ্যোতিষী দু'বার যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণের মত সুর ক'রে বললেন, স্বাহা, স্বাহা।

প্রকাশ বলল, আপনার উপাধি হওয়া উচিৎ ছিল জ্যোতিষ-সম্রাট।

ভৃগুলাঞ্ছন মৃদুহেসে বললেন, ফুটপাথে ব'সে সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন!

—আপনি রাস্তার উপর একখানা ঘর দেখুন। চেম্বার ভাড়া ফার্ণিচার—সব কিছুরই আমি ব্যবস্থা করে দে'ব।

জ্যোতিষীর মুখখানা খুসীতে ভ'রে উঠল। খুসীর সর্বাধিক কারন—পুলিশকে দক্ষিণা দান ও তাদের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি।

যাওয়ার সময় প্রকাশ আবার বলল, দয়া ক'রে দেখবেন। আজ রাত আটটায় যেন তার দেখা পাই।

৮

রাত পৌণে আটটা। স্থান, দেবেনবাবুর বাড়ী।

আর একটু হলেই দুজনের মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে যেত। তা হ'লনা বটে কিন্তু প্রকাশ স্প্রিংএর দরজাটা ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে একজন বলে উঠল—উঃ! এবং ঠেলে দেওয়া মাত্রই নাকের ডগা চেপে ধরে যে বেরিয়ে এল সে স্বয়ং উট্রাম।

পরস্পরের এই অচিন্ত্যপূর্ব সাক্ষাতে উভয়েরই বিস্ময়ের সীমা রইলনা। প্রকাশ বলল, তুমি এখানে উদয়দা?

উট্রাম প্রথমে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, এঁরা আমার দেশের লোক।

প্রকাশ বলল, তোমার দেশের লোক! এতদিন বলনি কেন?

—আমি জানতামনা যে এদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ আছে।

প্রকাশের ইচ্ছা ছিল আরও প্রশ্ন করে কিন্তু উদয়রামের ঠিক তার বিপরীত।

—দেবেনবাবু ঐ ঘরে আছেন তুমি যাও, বলেই সে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডানদিকের ঘরে বসে দেবেনবাবু একটা খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টাচ্ছিলেন।

প্রকাশকে দেখে উচ্ছসিত হ'য়ে বললেন, আসুন, আসুন প্রকাশবাবু!

—দয়া করে আমায় তুমি বলবেন। বয়সে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে পদমর্যাদায় সব বিষয়েই আপনি শ্রেষ্ঠ, বলতে বলতে ঘরে ঢুকল প্রকাশ।

দেবেনবাবু হেসে বললেন, অন্য কিছুতেই শ্রেষ্ঠত্ব আমার নেই। তবে বয়সের দাবিতে অবশ্য তুমি বলতে পারি, কিন্তু আজকালকার ইয়ং বেঙ্গলেরা ওটা পছন্দ করেননা।

—যাঁরা করেননা তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু আমি আপনার কাছে তু[illegible] শুনলেই সুখী হব।

—বেশ, বেশ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং; তোমার ওটাও একটা ভূষণ।

দেবেনবাবু তারপর চায়ের হুকুম করে বলতে লাগলেন, ভারী সুখী হয়েছি তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। বয়সের যতই পার্থক্য থাক না কেন আমার মনের মিলন হয় প্রকৃত রসিক লোকের সঙ্গে।

—আপনি নিজে একজন ..তবড় রসজ্ঞ ব্যক্তি কিনা।

—ঠিক বলেছ, আমি আজকাল সত্যিকার ইন্‌টারেষ্ট পাই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে। কিন্তু প্রতিমা যখন নাচ শিখতে আরম্ভ করল তখন আমিও আরম্ভ করলাম নৃত্যশাস্ত্র চর্চা করতে। ওর

দেহের কমনীয় গঠনের সঙ্গে নাচের যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেদিকে ছিল আমার বেশী ঝোঁক। উঁচুদরের নাচের যোগ্য ওর গড়ন, নয় কি প্রকাশ?

—নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে? আই ক্যান সোয়ার অ্যাজ টু দ্যাট।

—ঐটে করনা প্রকাশ, শপথ সম্বন্ধে—

প্রকাশ বলল, মাপ করবেন অন্যায় হয়েছে।

—না, না, অতটা লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।

এরপর আরম্ভ হোলো সাহিত্য চর্চা।

দেবেনবাবু আলমারী খুলে পুঁথির একটা তাড়া বার করতে করতে বললেন, এইগুলো হচ্ছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর সঙ্গে অনেক মূল্যবান জিনিষ আছে, তুমি বোধ হয় জান আমি একজন 'গবেষক'।

প্রকাশ অন্যমনস্কভাবে বলল, হু!

—আমার গবেষণার বিষয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য। বহু টাকা ব্যয় করে তৎকালীন অনেক পুঁথি আমি সংগ্রহ করেছি। চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাহা থেকে আনিয়েছি 'অশ্বত্থামা-বিকর্ণ সন্দেশ'। জানত শহরটার নাম প্রাগ নয় প্রাহা।

—হ্যাঁ!

প্রকাশ হুঁ, হাঁ করছিল বটে কিন্তু তার পিপাসু চোখ ও মন পড়েছিল দরজার দিকে। প্রতিমা কোথায়? প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেল, তবু তার দেখা নেই!

দেবেনবাবু বললেন, বের্লিন থেকে আনিয়েছি 'কাব্য-ডিণ্ডিমের কণ্ডুয়ন'।

—বই দুখানা কি ধরনের?

—অশ্বত্থামা-বিকর্ণ সন্দেশ একখানা সোসিও-হিসটো-পলিটিকাল

আলোচনার বই, তাতে সেকেলে বাঙলা ভাষার অদ্ভুত সব নমুনা পাওয়া যায়। সেইদিক থেকে বইখানি মূল্যবান।

—কণ্ডুয়ন ?

—কাব্য ভিণ্ডিমের কণ্ডুয়ন একখানা উচুদরের 'সেটায়ার'।

এই সময় প্রতিমা ঘরে ঢুকলে দেবেনবাবু তাকে উদ্দেশ করে বললেন, এই যে মা, প্রকাশের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করছিলাম। উনি হচ্ছেন যাকে বলে প্রকৃত রসবেত্তা।

—আর আমার প্রতিমাও—বুঝলে প্রকাশ, সাহিত্য বোধ ওঁর অপূর্ব।

প্রকাশ বলল, নিশ্চয় !

দেবেনবাবু বললেন, তারপর ওর নাচের কথা তো আগেই আলোচনা হ'য়েছে। ভগবান ওর সমস্ত অবয়বে এমন একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা—

বাধা দিয়ে প্রকাশ বলল, সি ইজ্ দি ক্রিম অব ইণ্ডিয়ান ড্যান্স্। বলেই তাব মুখখানা রাঙা হয়ে গেল।

কথাটা শুনে প্রতিমা হেসে ফেলল। প্রকাশের মনে হল কেন সে আর্টিষ্ট হয়নি, হ'লে এই হাসিটুকুকে রংয়ে ফলিয়ে ধন্য হ'তে পারত।

চা'র জল এলে দেবেনবাবু প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মা ফিরেছেন ?

প্রতিমা—না। ফোনে জানিয়েছেন, ফিরতে রাত অন্ততঃ ন'টা হবে।

দেবেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তবে চা টা তুমিই কর।

প্রতিমা চা তৈরী করতে ল পারত না, কিন্তু প্রকাশ কাপে চুমুক দিয়েই বলল, চা টা হয়েছে হাই-ক্লাশ !

দেবেনবাবু প্রতিমাকে বললেন, তুমি চা খাবে না ?

—এই যে নিচ্ছি বাবা।

প্রকাশের মনে হ'ল, প্রতিমাকে তারই অনুরোধ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু লাজুক ব'লে যে-সময় যা' করা উচিৎ, তা সে ক'রে উঠতে পারে না। এ-লজ্জা ক্ষমারও অযোগ্য।

চা ও জলযোগের পর দেবেনবাবু নিজের লেখা পড়তে আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমে পড়লেন—'আদি বাংলা ঔপন্যাসিক'।

প্রবন্ধটি নাতি-বৃহৎ, এতে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বাংলার কথাসাহিত্যের জন্মদাতা হরিহর ভট্টশালী। তাঁর উপন্যাসের নাম 'আশানন্দ ঢেঁকি'। বইখানি বীরবর আশানন্দ ঢেঁকির জীবনালেখ্য।

প্রকাশ বলল, আমার দাত্থ বলেন, হংসেশ্বর তর্কবাগীশের 'বিধিলিপি' বাংলার প্রথম উপন্যাস।

—'বিধিলিপির' কথা আমিও শুনেচি। তবে, জান তো—নানা মুনির নানা মত!

'আদি ঔপন্যাসিক' পড়া শেষ হলে তিনি বললেন, আর একটা রচনা তোমায় শোনাতে চাই, অসুবিধে হবে না তো?

প্রকাশ বলল, না, না, আপনার লেখা শুনতে অসুবিধা!

সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারে। প্রতিমা সামনে থাকলে প্রবন্ধ শোনার ক্লেশ তো দূরের কথা, তার চেয়ে বেশী কষ্ট সহ্য করতেও সে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ শোনার সময় প্রকাশের সাহস বাড়ল, তিনবার সে প্রতিমার দিকে তাকাল, এবং তিনবারই চার চোখের মিলন হয়ে গেল।

দেবেনবাবু গভীর একাগ্রতা নিয়ে প্রবন্ধ পড়ছিলেন। এরকম মনোযোগী শ্রোতা তিনি অনেকদিন পাননি; তাঁর মন প্রকাশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

পাঠ শেষ হ'লে তিনি বললেন, এ প্রবন্ধ যারা শুনেছেন, তাঁরাই বলেছেন অপূর্ব।

—বলবেনই তো। মোহিত মজুমদারের পর সাহিত্য সম্পর্কে এমন প্রবন্ধ আর কেউ লেখেন নি। মোষ্ট্ অরিজিনাল।

—এ দু'টো লেখা এখনো কাগজে দিইনি। তবে আমার অনেক লেখাই বেরিয়েছে 'তাণ্ডবে'। কাগজখানা হাই-ক্লাশ সাপ্তাহিক। শুধু উঁচুদরের প্রবন্ধই ওঁরা ছাপেন। তবে, গল্প ও সিনেমার সমালোচনা থাকে না, তাই কাগজখানার সার্কুলেশন কম। ঐ কাগজে আমি লিখি 'ঘটকর্পর' নামে।

প্রকাশ বলল, ওঃ, আপনি ঘটকর্পর!

—তাহলে ঘটকর্পরকে তুমি আগেই চিনতে?—একদিন বাংলার সবাই চিনবে। সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার ফল নিশ্চয়ই পাব। মন দিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করিনি সাহিত্যের জন্যে। প্র্যাকটিস্ তো একরকম ছেড়েই দিয়েছি। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা চলে গেছে আমার মাথার উপর দিয়ে!

প্রকাশ বলল, বাণীর পূজারীরা অনেক কিছু কষ্ট সহ্য করে জগৎকে আনন্দ দিয়ে যান।

—ঠিক বলেচ! মাইকেল, হেমচন্দ্র, ভাওয়াল কবি গোবিন্দ দাস এরা হচ্ছেন এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। যাক—আমি ভাবছি একটা বই লিখব, "সূচনা যঃ পলাশীতে"।

—পলাশী-যুদ্ধের পর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বুঝি?

—ঠিক ধরেছ। এই বইতে প্রচলিত অনেক ভুল মত খণ্ডন করে নতুন মতের প্রতিষ্ঠা করব। নতুন-নতুন আলোকসম্পাত হচ্চে বাঙলা সাহিত্যের ওপর। বুঝলে প্রকাশ?

প্রকাশ বলল, পলাশীর যুদ্ধ খুব ভাল বিষয়!

—তুমি বড় অন্যমনস্ক। যুদ্ধ নয়—যুদ্ধোত্তর বাঙলা সাহিত্য।

এই সময় ঘড়িতে 'ঢং' করে একটা শব্দ হল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেবেনবাবু বললেন, রাত হয়ে গেল—তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে, প্রকাশ। আজ তবে থাক।

প্রকাশের রাগ হল ঘড়িটার ওপর। ঘড়ি এত তাড়াতাড়ি বাজে কেন ? গরীবের ঘড়ি, রোগীর ঘড়ি, রেফিউজীর ঘড়ি তাড়াতাড়ি বাজুক, কিন্তু যে ঘড়ির সামনে প্রতিমা বসে আছে, সে ঘড়ি খানিকক্ষণ বন্ধ থাকলেই বা দোষ কি ?

৯

উদয়রাম প্রকাশকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। সহ্য করেছে তার শৈশব ও কৈশোরের অনেক অত্যাচার।

তার মার শরীর ভাল না থাকায় কখনো তাকে নিজের হাতে খাইয়েছে। দশ বৎসর বয়সে প্রকাশ মাতৃহারা হওয়ার পর থেকে তাকে পালন করার সম্পূর্ণ দায়িত্বই পড়ে উদয়রামের উপর।

প্রকাশ ডাকত তাকে 'উদয়দা' বলে, ভালবাসত বড় ভাইয়ের মতন।

তারপর কেটে গেছে দেড় যুগ। প্রকাশ আজ কলেজের অধ্যাপক, কিন্তু উদয়রাম সেই উদয়দাই থেকে গেছে।

প্রকাশের কাছে সে উদয়দা বটে, কিন্তু আর সকলের কাছে আজ সে 'উট্রাম'।

প্রকাশের বয়স যখন ছয়, তখন তার গৃহ শিক্ষক হিসাবে উদয়রাম এই সংসারে প্রবেশ করে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নম্র ব্যবহার এবং আরো অনেক গুণ থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

আজ বিশিষ্ট দু'জন লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, বাজারে পাঠাও উদয়রামকে। গিন্নীর অসুখ, হলধর বললেন—উদয়, তুমি একবার ডাক্তার বাড়ী যাও। না হ'লে ডাক্তারকে ঠিক রিপোর্ট দেওয়া হবে না।—ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, কোনো দায়িত্ব-

পূর্ণ কাজ তাকে দিয়ে না করালে হলধর ও তাঁর স্ত্রীর মনঃপূত হ'তো না।

অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশের বিদ্যা উদয়রাম হাটীর নাগালের বাইরে চলে যায়, কিন্তু চাকরী তার বজায় থাকে। তাকে না হলে হলধরের চলে না—সেও ছাড়তে পারে না এই পরিবারের বন্ধন। হাকিম হলধর স্থান হ'তে স্থানান্তরে বদলী হ'ল, উদয়রামও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

অল্পদিন পরে হলধরের পত্নী বিয়োগ ঘটে। আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে পরামর্শ দেন। প্রৌঢ় হলধর দার আর পরিগ্রহ করেন না, কিন্তু ধরেন মদ।

ছোট শহরের বড় হাকিম—লোকে জানে আদর্শ সংযমী পুরুষ বলে। সেই সুনাম বজায় রাখার জন্য হলধর ঘরের দরজা বন্ধ করে গোপনে মদ্যপান করেন। বিশ্বাসী উদয় মদ কিনে আনে। সোডা মিশিয়ে গ্লাশে ঢেলে দেয়।

মদ মেশানো সোডার বুদবুদের দিকে চেয়ে হলধর বলেন, হাউ নাইস্! এগুলো হাইড্রোজেনের এক একটি এটম্!

নেশার একজন সঙ্গী চাই, উদয়রাম ভদ্রসন্তান—তার সঙ্গে মদ খেতে দোষ কি? নেশা জমলেই হলধর বলেন, একটু টেষ্ট করে ছাখ উদয়—!

সে প্রথমে আপত্তি করত, কিন্তু বেশীদিন তা বজায় রইল না! উদয় মদ ধরল।

নেশার ঝোঁকে হাকিম সাহেবের একদিন মনে হল, 'উট্রাম' নামটা বেশ! যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি জোরালো। সেই দিনই উদয়রাম 'উট্রামে' পরিণত হ'ল। এই হ'ল উট্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই কাহিনীর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে, উট্রাম নিজের অবস্থা ঠিক উপলব্ধি করে না!

গৃহ-শিক্ষক উদয়রাম, 'বাবু' রূপে এসে আজ বনে গেছে এক 'বাবু চাকর'।

বড় হয়ে প্রকাশ দেখল, উদয়দা তার দাতুকে মদ ঢেলে দেয়, নিজে মদ খায় এবং টাকা পয়সার হিসাবেও গোলমাল করে। মনে মনে বিরক্ত হ'লেও, বাল্যস্মৃতি স্মরণ করে সে তাকে কিছু বলে না। 'উট্রাম' বলেও ডাকে না। আজ পর্যন্ত সে তার 'উদয়দা'ই বজায় রেখেছে।

প্রকাশ জানে তার দাতুরও দরকার এইরকম একজন লোকের। হয়ত বা তাকে বরদাস্ত করে সেই জন্যই।

দেবেনবাবুর বাড়ী থেকে ফিরেই প্রকাশ ডাকল, উদয়দা?

উট্রাম তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করল। অনেকদিন এরকম হৃদ্যতার সঙ্গে সে ডাকেনি। সে বলল, কি ভাই?

—দেবেনবাবুদের চেন কতদিন থেকে?

—অনেকদিন।

—আমায় বলনি কেন?

—আমি তো জানতুম না যে তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ আছে!

—ও, তা বটে! বেশ ভাল লোক ওরা, না?

—হ্যাঁ।

—খুব সদাশয়?

উট্রাম বলল, হ্যাঁ।

প্রকাশ বলল, যেমন বাবা, তেমনি মেয়ে।

—মেয়েটি বেশ ভাল।

—ভাল তুমি কি করে জানলে?

—ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

—ওঃ, তুমি ভাগ্যবান পুরুষ।

উদয়রাম আজ নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করল। প্রকাশের কাছ থেকে এরকম সদয় ব্যবহার পায়নি অনেক দিন।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে দেবেনবাবুদের আলাপ হ'ল কোথায়?

উট্রাম বলল, দেবেনবাবুর শ্বশুর বাড়ী আমাদের গাঁয়ে। ওরা আমাদের জমিদার।

—জমিদার?

—হ্যাঁ, দেবেনবাবুর স্ত্রী আমাদের জমিদার ছিলেন।

সেদিন থেকেই উট্রামের মর্যাদা বেড়ে গেল। দেখা হলেই প্রকাশ বিনা কারণেও দু'একবার 'উদয়দা' ব'লে ডাকে।

দিন দুই পরে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, ওদের খবর কি?

—কাদের?

—প্রতিমার, 'আই মিন' দেবেনবাবুর।

—ডল-এর কথা জিজ্ঞাসা করচ? ওর নাম যে প্রতিমা, তা তো জানতুম না!

—যাক, ওরা আছে কেমন?

—এই ক'দিনের খবর তো আমি জানি না। আমি যাই কালে ভদ্রে।

প্রকাশ আশা করেছিল, নিজের লেখা শোনাবার জন্য দেবেনবাবু তাকে ঘন ঘন আহ্বান করবেন।

সাত-সাতটা দিন কেটে গেল, দেবেনবাবু কোনো খবরই দিলেন না। সে ভাবল, ব্যাপার কি? প্রকাশ বুঝতে পারলনা, লেখা শোনাবার যাঁর এত আগ্রহ, তিনি হঠাৎ এরূপ নীরব হয়ে গেলেন কেন!

প্রকাশ ভৃগুলাঞ্ছনের কাছে ছুটল। তিনি বললেন, রুহু ধৈর্যম্। ভৃগু বলেছেন, প্রেমে ধৈর্য্য সর্ব বিঘ্ননাশন।

বাড়ি ফিরে প্রকাশ উট্রামকে বলল, তুমি একদিন দেবেনবাবুদের খবর নিয়ে এস না উদয়দা।

উট্রাম, হ্যাঁ যাচ্ছি যাবো বলে গড়িমসী করে।

অগত্যা প্রকাশ একদিন ফোন্ করল। মোটা গলায় জবাব এল, কা'কে চাই ?

—দেবেনবাবুকে !

—তিনি বাড়ী নেই। আপনি কে ?

—দেবেনবাবু বাড়ী ফিরলে দয়া করে বলবেন, প্রকাশ মুখুজ্জে—

—প্রকাশ মুখুজ্জে ? সে আবার কে ?

—আমিই প্রকাশ মুখুজ্জে ! তাঁকে বলবেন, আমিই ফোন্ করেছিলুম। তিনি ভাল আছেন তো ?

—হুঁ। বলেই লোকটি রিসিভার ছেড়ে দিল।

বৈকালে রায়বাহাদুর প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলেন,—মুখ এত ভারী কেন ভাই ? প্রতিমা ধম্‌কে দিয়েছে বুঝি ?

—তার খবরই পাচ্ছি না !

—অল্ রট্ ! দেবেন চক্কোত্তিরা হচ্ছে এ ফ্যামিলি অফ ফুল্‌স।

—না দাদু, খুব ভাল ফ্যামিলী।

হলধর হেসে বললেন, আমি অবশ্য প্রতিমাকে বাদ দিয়েই বলেছি ! একটু থেমে তিনি আবার আরম্ভ করলেন,—ফুল্‌স নয় ? পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে, তুমি কলকাতার এতগুলো বাড়ীর মালিক, আমারও একমাত্র উত্তরাধিকারী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান—তোমাকে যদি ওরা হেলায় হারায়, তাহ'লে বোকা ছাড়া আর কি বলব, বল ?

—ওরাও কম নয়, দাদু ! দেবেনবাবুর শ্বশুর ছিলেন বিরাট

জমিদারীর মালিক। তাঁর একমাত্র সন্তান হিসেবে প্রতিমার মা অনেক টাকা পেয়েছিলেন। আজ জমিদারী নেই বটে, কিন্তু তিনি মস্ত বড় একটা ওষুধের কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মাসে চার হাজার টাকা ড্র করেন। চৌরঙ্গীতে ওদের আপিস।

—দেবেনবাবু না হয়ে তার স্ত্রী ডিরেক্টর হলেন কেন?

—মহিলার বাবা সেইরূপ ব্যবস্থা করে গেছেন। তিনিই মালিক ছিলেন তো।—তাছাড়া ওরা হয়ত বিলেত ফেরত বর খুঁজছেন। হয়ত ব্যারিষ্টার নয় ইঞ্জিনীয়ার।

—অল্ রট্! আজকাল জাতটার ঝোঁক পড়েছে মিস্ত্রির দিকে। সকলেই ছেলেকে আর জামাইকে মিস্ত্রি বানাতে চায়।

—কিন্তু, আরো—আরো বড় জামাই তো ওঁরা চাইতে পারেন! প্রতিমা ইজ ফিট টু বি দি কুইন অফ···কুইন অফ—

—কুইন অফ দি কনগোজ! হলধর পাদ পূরণ করে দিলেন।

—তুমি তাঁকে কঙ্গোরাণী বললে দাদু!

—হ্যাঁ, বলেচি। যে-জাতের মধ্যে লুমুম্বা জন্মেছেন, সে জাতকে আমি শ্রদ্ধা করি।

প্রকাশের মুখে আজকের ফোনের কথা শুনে হলধর গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু ভেবে বললেন, অল্ রট। যাক্, আজ রাত্রে ক্ষিতীশকে নিমন্ত্রণ কর। আমিও তিনটি বন্ধুকে বলেছি। আজ আমরা প্রতিমার স্বাস্থ্য পান করব।

রাত্রে ক্ষিতীশ ও হলধরের তিনটি বন্ধু ডিনারে যোগদান করলেন। কারো স্বাস্থ্য পালন করলে যদি সত্যিকার স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে হলধর-বন্ধু চতুষ্টয় প্রতিমার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে যে পরিমান মদ্য পান করলেন, তাতে প্রতিমার শতায়ু কেন, সহস্রায়ু হওয়ার সম্বন্ধেও প্রকাশের আর কোনো সন্দেহ থাকত না।

বিখ্যাত কংগ্রেসী এম্, এল, এ ননীবাবু বেশী মদ খেলেন, না কমিউনিষ্ট এম্, পি তাঁকে হারিয়ে দিলেন—এ সম্পর্কে ক্ষিতীশ ও প্রকাশ বাজী ধরতে যাচ্ছিল ; এই সময় উট্রাম বলল, না—ওঁদের হার হয়েচে হিমাচল বাবুর কাছে।

—হিমাচলবাবুটি কে ? ক্ষিতীশ প্রশ্ন করল।

উট্রাম বলল, উনি একজন সনাতনী হিন্দু, তার উপর পুলিশ কোর্টের মস্ত বড় উকিল।

হলধর কেন যে ক্ষিতীশকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁর মনে ছিল না। আহারান্তে প্রকাশ মাতামহকে জিজ্ঞাসা করল,—ক্ষিতুকে কিছু বলবে, দাদু ?

—ক্ষিতু ? প্রতিমার বন্ধু দীপা—তার ভাই ক্ষিতু ? অল্ রট্।

প্রকাশ ক্ষিতীশকে নিজের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল। ক্ষিতীশ বলল, তুমি অত মুষড়ে পড়চ যে ?

—আজ সাতদিন হয়ে গেল, প্রতিমার কোনো খবর নেই। ফোন্ করেছিলুম—তার যা রিসেপসন পেয়েছি, সেটাও মোষ্ট ডিস্-এপয়েন্টিং!

—কে ফোন্ ধরেছিলেন ?

—মনে হল কোনো বয়স্কা মহিলার কণ্ঠস্বর! ভারী চড়া আওয়াজ!

ক্ষিতীশ এবার মুখ গম্ভীর ক'রে বলল, চিন্তার বিষয় বটে!

—তুমিও বলচ চিন্তার বিষয় ? তা হলে তো···আচ্ছা, দেবেন-বাবু চটে গেলেন নাকি আমার ওপর ?

—ক্ষ্যাপাটে ধরণের মানুষ তিনি, কিন্তু রাগতে জানেন না।

—ক্ষ্যাপাটে বললে প্রতিমার বাবাকে ?

—উচ্ছ্বাস রাখ দেখি।

—আমি মনে করছিলুম, একবার দেবেনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

—আপাতত থাক। আমি দীপাকে দিয়ে খোঁজ করি আগে।

বন্ধুর সঙ্গে আলোচনার ফলে প্রকাশের মন আরো খারাপ হয়ে গেল! ভয় হল, একখানা কালো মেঘ হয়ত তার ভাগ্যাকাশের নবোদিত সূর্যকে গ্রাস করতে আসছে। হয়ত বা গ্রাস করেই ফেলেছে।

একটুক্ষণ ভেবে প্রকাশ বলল, আমি একবার প্রতিমাদের বাড়ি গেলে হয় না?

—না, না! গেলে ফল তো ভাল হবেই না, বরং—

—বরং কি?—প্রকাশ ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

ক্ষিতীশ বলল, শুনেছি, প্রতিমার মায়ের গলা খুব মোটা। মেজাজী মানুষ তিনি। তিনি যখন তোমার নাম শুনেই ফোন্‌টা রেখে দিয়েছেন, তখন তোমার যাওয়া কোনো মতেই সঙ্গত হবে না।

—দেবেনবাবু যে আমার পক্ষে?

—তাতে কোনো লাভ নেই বন্ধু! প্রতিমার মায়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী!

—আচ্ছা, তাহলে একবার দীপাকে পাঠালে কেমন হয়? সে ব্যাপারটা বুঝে আসতে পারে! বোধ হয় দাদুও তোমাকে ডেকে-ছিলেন সেই জন্য!

—আচ্ছা আমি দীপাকে বলে দেখি।

প্রকাশ বলল, হ্যাঁ, দীপা খুব বুদ্ধিমতী। ব'লেই তার মনে হল, মেয়ে মহলের উৎসবে সভাপতি। ভাষণে দীপাকে প্রশংসা না ক'রে, কী ভুলই না করেছে!

১০

আলোর নীচে অন্ধকারের মত প্রতিভার খুব নিকটেই থাকে কতকগুলি বিরোধী শক্তি। প্রতিভাকে যারা শুধু অস্বীকারই করেনা অবিশ্বাসও করে এবং পদে পদে তার অগ্রগতিতে বাধা জন্মায়।

প্রতিভাবানের বেশীর ভাগ বাধাই আসে স্ত্রীর কাছে থেকে। তারা স্বামীর প্রতিভাকে বুঝতে ভুল করেন এবং এই ভুল বোঝার জন্য প্রতিভাধরের দাম্পত্য জীবন অসুখী হয়, অশান্তি লেগেই থাকে।

একদল এই দাম্পত্য বাধাকে অতিক্রম করে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। আর এক দলের ঘটে পরাজয়। আমাদের দেবেন চক্কোত্তি মশাই একজন শেষোক্ত শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তি।

তাঁর স্ত্রী দাক্ষায়ণী দেবী স্বামীর সাহিত্য সাধনায় অনেক বাধার সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু দেবেনবাবুর শক্তিকেই অস্বীকার করেননি। সাহিত্যকে তার জীবনের অসাফল্যের কারণ বলে ধরে নিয়েছেন।

মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উজ্জ্বল রত্নের হাতেই সম্প্রদান করেছিলেন তাঁর বাবা। সকলে আশা করেছিল জমিদার তরণতারণ রায়ের জামাতা একদিন হাইকোর্টের জজ হবেন। কিন্তু জজের পরিবর্তে দেবেন্দ্র নাথ হলেন একজন সাহিত্যিক। এতে স্ত্রীর রাগ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

পরিবার পালনের জন্য দেবেনবাবুকে অবশ্য কোন দিনই ভাবতে হয়নি। প্রথমে আসত মোটা মাসোহারা, তরণতারণ রায়ের মৃত্যুর পর পেলেন জমিদারী। তিনি নিজে জমিদার হলেন বললে ভুল করা হবে। জমিদার হলেন দাক্ষায়ণী। আর দেবেনবাবু বন্ধু-বান্ধবদের ভাষায় বলতে গেলে হলেন 'প্রিন্স কন্‌সর্ট'।

উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে দেবেনবাবুর নাম হলনা। মাসিক পত্রের আপিস থেকে গল্প কবিতা ফেরৎ আসতে লাগল।

কাগজের দাম চড়া, বাজার খারাপ এই সব মামুলী অজুহাতে প্রকাশকেরা তাঁর কোন বই নিলেন না। দেবেনবাবু নিজের খরচায় দু'খানা বই ছাপালেন। আলুওয়ালার মেয়ে এবং আগ্রা সুন্দরী। উপন্যাসগুলি শেষটায় মুদীরা সেরদরে কিনতে লাগল।

দেবেনবাবু মনে করলেন স্রষ্টা সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে সমালোচক হওয়াই শ্রেয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই দেখলেন সাহিত্য জগতে সমালোচকের শত্রুই বেশী। যার লেখা খারাপ বলেন সে শুধু তাঁর বোধ শক্তির নিন্দা করেই ক্ষান্ত হয় না, অন্বেষণ করে সহস্র ছিদ্রের।

কেউ তার নাম দিলেন গৃহপালিত জামাতা বা ডোমেষ্টিকেটেড সন-ইন-ল। সাপ্তাহিক 'শিষ্যা' বার করল 'অথ দ্রাক্ষা-দেবেন্দ্র সংবাদ'।

দেবেন্দ্র নাথ এরপর প্রবেশ করলেন গবেষণার গহন বনে।

আজ কয়েক বছর গবেষণা নিয়েই থাকেন। খাতার পর খাতা লিখে আলমারী বোঝাই করেন। লিখে আনন্দ পান তিনি কিন্তু তার চেয়েও বেশী খুসী হন কেউ তাঁর রচনার প্রশংসা করলে।

তাঁর গোটা কয়েক লেখা তাণ্ডবে প্রকাশিত হয়েছে। বিনিময়ে সম্পাদক রোহিতাশ্ব দেবেনবাবুর বাড়িতে কয়েকবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন, তাঁর মোটরে চড়েছেন।

রোহিতবাবু অত্যন্ত ভদ্রলোক এবং কৃতজ্ঞ প্রকৃতির! মোটরে চড়ে স্নিগ্ধবায়ু সেবন করলে তার এই গুণটি সমধিক প্রকাশ পায়। তখন বলেন আপনাব লেখার খুব প্রশংসা হচ্ছে।

দেবেনবাবুর বন্ধুরা বলেন রোহিতাশ্ব তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছেন, নিয়েছেন অবশ্য তাণ্ডব চালাবার জন্য।

দেবেনবাবুর কোন ব্যক্তিগত আয় ছিলনা। সহধর্মিনীর প্রদত্ত মাসোহারার টাকার উপরই নির্ভর। জমিদারী থাকার সময়ে দাক্ষায়াণী তাকে যে টাকা দিতেন ওষুধের কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে তাঁর পরিমাণ অর্দ্ধেক করে দিয়েছেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কমিশন, শেয়ারের ডিভিডেণ্ট এবং বাড়িভাড়া ইত্যাদি নিয়ে দাক্ষায়ণীর বার্ষিক আয় দু'লাখ টাকার উপর। তা থেকে স্বামীকে আজকাল মাসিক হাত খরচ দেন দু'শ

টাকা। তিনি ঐ টাকা দিয়ে পুরনো পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। দাক্ষায়ণী বলেন, বোকা পেয়ে লোকে ওকে ঠকিয়ে নেয়। তিনি বুঝেছেন স্বামীকে সংশোধন করা অসম্ভব। সাহিত্য ব্যাধি তাকে পেয়ে বসেছে।

প্রকাশ যে দিন লেখা শুনতে যায় সেদিন বাড়ী ফিরে দাক্ষায়ণী টিপট কাপ সব ছড়ান রয়েছে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কোনও সাহিত্য রসিক এসেছিল বুঝি ?

দেবেনবাবু বললেন, ফার্ষ্ট গ্রেড কলেজের একজন প্রফেসার এসেছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।

—নিশ্চয়ই তোমার লেখার সুখ্যাতি করেছে ?

—তুমি ছাড়া সকলেই করে।

—এই পণ্ডিতটির সঙ্গে আলাপ হল কবে ?

—কাল।

—এরই মধ্যে নিমন্ত্রণ করেছ লেখা শোনাবার !

—তিনি আসতে চাইলেন, কাল ইনিই প্রতিমাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন।

—ও কালকের সেই ছোকরা সভাপতি, টিকিওয়ালা গজ-কচ্ছপ।

—ভাল ছেলে, খুব সাহিত্যানুরাগী।

—যেমন অনুরাগী ছিল কমরেড সুসীম, কবি রক্তোৎপল; পাবলিকেশন বিজিনেসের জন্য সুসীমত তোমার অনেক টাকাই ফুঁকে দিয়েছে।

এর আগেও দেবেনবাবুর এরকম বহু শ্রোতা জুটেছে। কেউ প্রকাশক-সাহিত্যিক, কেউ ব্যারিস্টার কবি, কেউ বা নিছক দরিদ্র সাহিত্যিক আর কেউ বা দৈনিক কাগজের সাব এডিটর। তাঁর লেখার সুখ্যাতি করেছে সবাই। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বোঝা গেছে তাদের সাহিত্য প্রীতির উৎস দেবেনবাবুর লেখা নয়।

প্রতিমা অথবা এই পরিবারের ধন সম্পদ, তবে বেশীর ভাগ সাহিত্য রসিকই এসেছে প্রতিমার আকর্ষণে।

প্রকাশ ও এই দলেরই একজন, দাক্ষায়ণী এইরূপ ইঙ্গিত করায় দেবেনবাবু প্রতিবাদ করলেন।—না না তা নয়, প্রকাশ ইজ অল গোল্ড।

—গিলটি বেরিয়ে পড়বে দেখো—। গোল্ড সেজেছেন প্রতিমার জন্য।

সাহিত্যকে অবলম্বন করে স্বামী স্ত্রীতে আজ কাল আর তত খিটি মিটি হয়না। এখন দুজনের যত কিছু মত বিরোধ প্রতিমার বিবাহ নিয়ে। দাক্ষায়ণী কোন পাত্র পছন্দ করলেই দেবেনবাবু বেঁকে বসেন, আর কোন পাত্র তাঁর মনোনীত হলেই দাক্ষায়ণী বলেন, ছেলেটি হয় সাহিত্য পাগল নয়ত ওর লেখার সুখ্যাত করে মন ভিজিয়েছে।

দাক্ষায়ণীর পছন্দ ব্যরিস্টার নয়ত বিলাত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার।

বিলাত ফেরতে দেবেনবাবুর ঘোর আপত্তি। তিনি বলেন, বিলাত ফেরতেরা প্রায় সকলেই মদ খায়, অন্তত বিলেতে খেত। মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নাষ্টি করেছে তাদের মধ্যে অন্তত শত করা নব্বই জন। মদ্যপের হাতে কন্যা সম্প্রদান আর জুয়াচোরকে সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করা একই কথা। তিনি চান শান্তশিষ্ট সুশিক্ষিত একটি পাত্র। মনে মনে ভাবেন, ছেলেটি সহিত্যামোদী হলে আরও ভাল হয়।

দাক্ষায়ণীর চোখে শান্ত স্বভাব একটা গুণের মধ্যেই নয়। ওটা হল নেগেটিভ ভারচু। সাহিত্য প্রীতি সম্পর্কে তাঁর মত, ও হল কর্মনাশা ঝোঁক, মানুষকে অপদার্থ করে দেয়।

অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পত্নীর ভয়ে দেবেনবাবু প্রকাশকে আর লেখা দেখাতে ডাকেন নি। প্রকাশের সঙ্গে ফোনে কথা

বলার পর দাক্ষায়ণী স্বামীকে বললেন, তোমার সাহিত্যরসিক মাস্টার আজ ফোন করেছিল।

—কি বললে?

—বলবে আর কি, একবার এখানে আসতে চায়, এই হল মোদ্দা কথা—

—তুমি তার উপর অবিচার করছ।

—অবিচার নয় মশাই!

—তুমি কী বললে তাকে।

—ঢং করে রিসিভার রেখে দিলাম।

দেবেনবাবু আর কোনো কথা বললেন না।

১১

কয়েকদিন যেতে না যেতেই দাক্ষায়ণী স্বামীকে বললেন, প্রকাশ মাস্টারকে ফোন্ ক'রে দাও।

—কেন বল দেখি?

—সে পরে হবে! বলে দিও কাল বিকেলে আসতে।

দেবেনবাবু বিস্মিত হলেন। বিলেত ফেরত নয় এমন কোনো অনাত্মীয় যুবককে নিমন্ত্রণ করা দাক্ষায়ণীর জীবনে এই প্রথম।

তিনি তক্ষণি প্রকাশকে ফোন করলেন,—কাল এস। আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ—।

প্রকাশ বলল, নিশ্চয়! তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন। আপনার শরীর কেমন? আপনাদের—

—আমাদের খবর ভাল।

দেবেনবাবু আগের দিনই একটা প্রবন্ধ শেষ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা, কালই প্রকাশকে প্রবন্ধটী শোনাবেন এবং তাকে তাঁর গবেষণার উপর একটা প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করবেন। কোনো

এক বহুল প্রচারিত কাগজে প্রকাশের প্রবন্ধটা ছাপা হ'লে গবেষক হিসাবে হু'দিনেই তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। এই বিজ্ঞাপনের যুগে প্রচার করতে না পারলে কিছুই হয় না। প্রচারের জোরে মেকী জিনিস উচুদরে বিকোয়, আর তা না করতে পারলে খাঁটী জিনিসেরও কোনো কদর হয় না।

পরদিন সারাটা বিকাল দেবেনবাবু সাগ্রহে প্রকাশের প্রতীক্ষা করছিলেন। বাইরে জুতোর শব্দ হ'ল, স্প্রিংয়ের কাটা দরজা ন'ড়ে উঠল। দেবেনবাবু ব'লে উঠলেন, এই যে এস। তোমার জন্যেই—

কথাটা শেষ হ'ল না। তিনি অকস্মাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

প্রকাশের বদলে মোটা চুরুট টানতে টানতে ঘরে ঢুকল পাতলুন পরিহিত বেঁটে-খাটো স্থূলবপু এক যুবক।—গুড্ ডে ড্যাড্, বলে সে দেবেনবাবুকে সম্ভাষণ জানাল।

দেবেনবাবু অপ্রসন্ন চিত্তে বললেন, এস।

যুবকটির নাম অতনু। এক নবীন ব্যারিস্টার।

অতনু জিজ্ঞাসা করল—ও. কে. ?

—হ্যাঁ। তোমরা ?

—সো. সো.—ব'লে অতনু মুখ ছুঁচলো ক'রে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল।

দেবেনবাবুর মন বিরক্তিতে ভরে গেল।

চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা চুরুট বার ক'রে অতনু বলল, —হ্যাভ ওয়ান প্লিজ! হাভানা—কাইণ্ড্ অফ্ সিগারস্!

দে-শলাই জ্বালিয়ে দেবেনবাবুর চুরুট ধরিয়ে দিতে দিতে সে গান ধরল—

হাম্পটি ডাম্পটি ডা—

হাম্পটি ডাম্পটি ডা—

আ—আ—আ—

এই সময় অতনুর অপরিচিতা এক তরুণীকে নিয়ে প্রতিমা ঘরে ঢুকল।

দে-শলাইয়ের কাঠির মন ব'লে কোনো পদার্থ থাকলে ঘটনার পরিণতি যে কী হ'ত, বলা যায় না।

চুরুটে অগ্নি সংযোগ শেষ হ'লে, উপরেই দাহ্য-পদার্থ পেয়ে জ্বলন্ত দে-শলায়ের কাঠির শিখাটা দেবেনবাবুব গোঁফের দিকে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিল।

প্রতিমার দিকে চেয়ে অতনু বলল, ভেরী গ্ল্যাড্ টু—

দেবেনবাবু লাফিয়ে উঠলেন,—গ্ল্যাড্! কী করলে ছাখ তো অতনু!

—আই সি!

দেবেনবাবু মুখ দিয়ে শুধু বেরোল—উঃ—

—সরি ড্যাড্! দ্যাট বিস্টলী ম্যাচ্ ষ্টিক্!

প্রতিমা এগিয়ে এসে দেখল, তার বাবার নাকের নীচে খানিকটা গোঁফ্ পু'ড়ে লাল একটা দাগ পড়ে গেছে! সে বলল, একটু 'বার্ণল' লাগিয়ে দেই, বাবা?

অতনু বলল, বার্ণল—ও. কে।

দেবেনবাবু বললেন, বেশ, দাও!

বৈঠকের সূত্রপাত হ'ল এই দুর্ঘটনার মধ্যে।

একটু পরে প্রকাশ এসে দেখল, গালে ন্যাকড়ার পটি লাগিয়ে দেবেনবাবু গম্ভীর হয়ে ব'সে আছেন। একটি প্রৌঢ়া দীপার সঙ্গে একটি স্থূলবপু যুবকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—এ হ'ল হাইকোর্টের একজন রাইজিং ব্যারিস্টার, অতনু রায়। কয়লার রাজা বিরূপাক্ষ রায়েব ছেলে। আর এ হচ্ছে দীপা·সেন, প্রতিমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড।

প্রকাশের মনে পড়ল ফোনের সেই কণ্ঠস্বর। উহা যে নারী কণ্ঠ হ'তে পারে এরূপ ধারণা তার ছিল না। আর আজ সে

দেখল, সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কিনা প্রতিমার মা! তার মনটা দমে গেল।

দেবেনবাবু স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, ইনি প্রফেসর প্রকাশ মুখুজ্জে। সুধী ও সাহিত্যিক। ইংরাজীতে গোল্ড্ মেডালিস্ট।

দাক্ষায়ণী প্রকাশের পা থেকে মাথা অবধি বার-দুই দেখে নিয়ে বললেন, অ—

তারপরই অতনুর দিকে ফিরে—বড় কষ্ট দেওয়া হ'ল তোমায়! কোর্ট থেকে সোজা আসচো বোধ হয়? কাপড় চোপড় ছেড়েও আসতে পারনি!

—কষ্ট? নট য়্যা বিট্। অবশ্য কোর্ট থেকেই ডাইরেক্ট আসচি। কাজের খুব প্রেসার। দু'টো ফাইল আছে মিঃ চাকলাদারের সঙ্গে। তিনি ষ্ট্রিক্ট সিনিয়র—খালি কাজ আদায়! ইণ্ডিপেণ্ডেট্ ফাইল্ ও আছে একটা, আলীপুর সেসন্স এ।

এবার দাক্ষায়ণী বললেন, তোমার ভাটিয়া মক্কেল বুঝি?

—না। এটা ইজিকিয়েল সাহেবের কেস। বিরাট ধনী জু তিনি। মিলিয়নেয়র, জলি গুড্ ফেলো। পড়েছে অবশ্য চোরাই ভাটিখানার মামলায়। তা—সিওরলি য়্যাকুট করব।

দাক্ষায়ণী স্বামীর দিকে চে'য় বললেন, আজকাল অতনুর কাজকর্ম এত বেশী যে, আসতেই সময় পায় না!

দেবেনবাবু মনে মনে ভাবলেন, না আসাই মঙ্গল!

অতনু চুরুট্ ধরাতে ধরাতে বলল, কাজের হেভী প্রেসার। ফেনমেন্যাল্ সাকসেস্।

দাক্ষায়ণী বললেন, তা'বলে আত্মীয়-স্বজনদের ভুললেও তো চলে না বাবা? প্রতিমা প্রায়ই তোমার কথা বলে!

ইচ্ছা থাকলেও প্রতিমা এই মিথ্যার প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে অতনু বলে, রাইট্ ও, ইট ইজ্ ভেরী কাইণ্ড্ অফ্ প্রেটি।

প্রতিমাকে সে ডাকে প্রেটি, এবার তার দিকে তাকিয়ে বলে, চাক্‌লাদার আমায় বলেন, মোষ্ট ব্রিলিয়ণ্ট ডেভিল।

প্রতিমা বিস্মিতভাবে অতনুর দিকে তাকায়।

দাক্ষায়ণী প্রতিমাকে বুঝিয়ে দেন, বড় বড় ব্যারিস্টাররা জুনিয়ারদের বলেন, 'ডেভিল'।

অতনু আগে শুধু কাটা কাটা ইংরাজী বলত, আজকাল মাঝে মাঝে তার বাংলা তর্জমা ক'রে দেয়। দেবেনবাবুর মনে হয়, ছোকরা দু'টো ভাষারই আদ্যশ্রাদ্ধ করে।

দাক্ষায়ণী বললেন, তুমি ওকে আসতে অনুরোধ কর, প্রতিমা। তোমার বাবার সাহিত্য শুনতে ঘন ঘন আসবার মতন প্রচুর সময় তো আর অতনুর নেই!

প্রতিমা কোনো কথা বলল না। দাক্ষায়ণী আবার বললেন, তোমার ভাল ক'রে অনুরোধ করা উচিত, প্রতিমা!

অতনু চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, নো, নো—অনুরোধ সুপারফ্লুয়াস,—তারপরই ওয়েষ্ট-কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বা'র ক'রে বলল, কনসালটেশান—গড়গড়ি।

দাক্ষায়ণী জানতে চাইলেন,—বড় ব্যারিস্টার বুঝি?

অতনু ডান হাতের পাঁচ-পাঁচটা আঙুল তুলে বলল, ভারতবর্ষের বিগ্ ফাইভ্-দের একজন। তার ইকোয়ালস্—চাটার্জি, পি আর দাস, শীতলবাদ আর আমার সিনিয়র চাকলাদার।

গড়গড়ির সঙ্গে কাজ অতনুর, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দাক্ষায়ণী। তিনি বারান্দায় গিয়ে ডাক-হাঁক সুরু-করলেন—সোব্‌রাতি, জলদি চায়ের জল নিয়ে এস। জলদি।

তারপরই ঘরে এসে প্রতিমাকে বললেন, ও কোর্ট থেকে আসচে, কিছু খাবার নিয়ে এস।

অতনু বল্লল, খাবার। সুপারফ্লুয়াস।

দাক্ষায়ণী বললেন, তা কি হয় বাবা? আমাদের দেখতে হবে যাতে তোমার শরীরটা ভাল থাকে।

তিনি নিজে চা তৈরী করলেন। চা খাওয়ার সময় বার-বার অতনুকে অনুরোধ করলেন, স্যাণ্ড্ উইচ্ আর প্রন্ কাটলেটটা খাও। ফলগুলোও ফেলে রে'খ না। কড়াই শুঁটির কচুরী ভাল হয়নি বুঝি?

অতনু খেতে খেতে বলল, ডিলিশাস্—উৎকৃষ্ট!

কচুরী খেতে খেতে সে দীপাকে প্রশ্ন করল, প্রেটির ক্লাশ ফ্রেণ্ড?

—হ্যাঁ।

—ভেরী গুড্। সাবজেক্ট?

—প্রতিমার সঙ্গেই ইংরাজীতে এম,এ, পড়ি।

—ব্রিলিয়াণ্ট, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে···গ্লাড ভেরী মাচ্।

দাক্ষায়ণী অতনুকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাব বাবার শরীর কেমন?

—চলছে দন্তশূল, ডায়বেটিস্; আর মাঝে মাঝে লক্-জ।

—প্রায়ই তো কণ্ঠ পান শুনতে পাই।

অতনু বলল, সেনিলিটি।

দেবেনবাবু এতক্ষণ নীরব ছিলেন। প্রকাশও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। তিনি এবার বললেন, তোমাকেও দু'খানা কড়াই শুটির কচুরী দিক, প্রকাশ?

দাক্ষায়ণী একটু দূর থেকে বললেন, অতনুর তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তাই আমার ভুল হ'য়ে গেছে প্রকাশবাবু। আপনাকেও খেতে হবে কিন্তু—লজ্জা করলে চলবে না!

প্রকাশ বলল, না, না. লজ্জা কসের?

দেবেনবাবু বললেন, প্রকাশকে 'আপনি' বলতে হবে না। ও

ছেলেমনুষ—যদিও এরই মধ্যে লিটারেচারের প্রফেসার হিসেবে খুব নাম করেছে।

দাক্ষায়ণী প্রকাশের দিকে একবার তাকালেন।

তাঁর অনুরোধে পড়েই হোক্ অথবা বুভুক্ষার জন্যই হোক —অতনু তিনজনেরও বেশী খাবার খেয়ে ফেলল। কিন্তু কোনো খাবার দিতে গেলেই বলে—সুপারফ্লুয়াস্।

খাওয়া শেষ হ'লে সে দীপার উদ্দেশে বলল, একটা গান হোক, মিস্ সেন।

প্রতিমা বলল, ও বেশ গায়।

দাক্ষায়ণী বললেন,—তুমি গান শিখচ বুঝি দীপা ?

দীপা বলল, হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। কোথায় শিখচ যেন ?

আজ নিয়ে দাক্ষায়ণী অন্ততঃ পাঁচবার এই প্রশ্ন করলেন। অন্য কেউ সামনে থাকলেই তিনি এইরকম তাচ্ছিলের ভাব দেখান বলে, দীপা এ-বাড়ীতে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। আজ এসেছে দাদার অনুরোধে, প্রতিমাও ফোন্ করেছিল। দু'জনের উপরেই তার রাগ হ'ল।

অতনু বলল, আপনি কোন্ স্কুলে গান শেখেন, মিস্ সেন ?

দীপা বলল, 'উত্তর কলিকাতা সঙ্গীত বিদ্যালয়'।

—ওঃ। নর্থ এণ্ড ? সাউথ এণ্ড মিউজিক স্কুল একজিকিউটিভ কমিটি।

দাক্ষায়ণী বললেন, তুমি বুঝি তার একজিকিউটিভ্ সভ্য ?

ঘাড় বাঁকিয়ে অতনু বলল, ইয়েস্ মাম্। সোসাল ডিউটি।

—ঠিক বলেছ। বড় যাঁরা, সমাজের প্রতি তাঁদের একটা ডিউটি আছে বৈ কি। কিন্তু নিজের উন্নতি না করেই এইসব ঝামেলা টেনে আনলে—কথাটা শেষ না করেই দাক্ষায়ণী স্বামীর দিকে তাকালেন।

পাদপূরণ করল অতনু—ফেইলিয়র সিওর। তারপর প্রতিমার দিকে ফিরে বলল, তোমার বন্ধুকে একখানা গান গাইতে অনুরোধ কর, প্রেটি।

প্রতিমার অনুরোধে দীপা গাইল—'তুমি ধন্য ধন্য হে—'

গান শেষ হ'লে অতনু চেঁচিয়ে উঠল—এন্‌চ্যানটিং!

দীপা জানত, গানটা ভাল হয়নি। অতনুর মতন লোকের সামনে গান গাওয়া একটা বিড়ম্বনা, তার উপর দাক্ষায়ণী উঁচু গলায় কথা বলছিলেন।

অতনু বলল, এবার তোমার টার্ণ, প্রেটি। সেই যে বিস্যুদবারের কি একটা ডেলিসাস্ গান—

—ডি এল রায়ের 'পার ত জন্মো না'ক বিস্যুদবারের বার বেলায়' —সেই গানটার কথা বলছেন বোধ হয়? ওটা আমার জানা নেই।

—ও. কে—'কোথায় যেন বাঁশী বাজায়'—সেইটে গাও।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী?

অতনু বলল, এন্‌চ্যানটিং! বাগরাম আগরওয়ালার গার্ডেন পার্টিতে শুনেচি।

প্রতিমা ধরল—'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী'।

তার সুন্দর কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘরময় একটা ঝংকার তুলল। প্রকাশ মুগ্ধ হ'য়ে গেল, দেবেনবাবু গানের তালে তালে মাথা নাড়তে লাগলেন।

প্রতিমার গান শেষ হ'লে অতনু বলে উঠল, বিউয়িচিং। তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করল,—ইয়োর এডড্রেস? সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইল দীপার ঠিকানা ও বিস্তৃত পরিচয়।

প্রতিমা বলল, দীপা এ্যাডভোকেট ক্ষিতীশ সেনের বোন।

—ক্ষিতিশ সেন? হার্ড হিজ নেম, টাইম ওভার।

দাক্ষায়ণী অতনুর জন্য প্রতিমাকে আবার একটু চা করতে বললেন।

দীপা বলল, ততক্ষণ আপনার একটা গান হোক, মিঃ রায়।

—গ্লাডলি, বলেই শরীর হুলাতে হুলাতে অতনু গাইতে আরম্ভ করল—'হ্যায় মহব্বত কা জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ,—বা—আ—আ—'

দাক্ষায়ণী ছাড়া আর সকলের কাছেই তার গানটা অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। প্রতিমার চা তৈরী হ'য়ে গেলে অতনু এক চুমুকে কাপের ধূমায়মান পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করল এবং মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ওয়াণ্ডারফুল্।

তারপর স্প্রিংয়ের দরজা পর্যন্ত গিয়ে একটা ঘূর্ণিপাক খেয়ে বলল, টাটা মাম্—টাটা প্রেটি। গুড্লাক টু অল।

বেরোবার সময় তার শরীরের আঘাতে স্প্রিংয়ের দরজাটা খুলে গিয়েছিল। সেটা ফিরে আসার আগেই অতনু তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

দাক্ষায়ণী বললেন, কাজের লোক বটে!

কেউ তার কথায় সায় দিল না।

দেবেনবাবু ভাবছিলেন, ছোকরা সন্ধ্যেটা একেবারে মাটি করে দিয়ে গেল।

প্রকাশ বুঝতে পারল, দেবেনবাবু এতদিন তাকে আসতে অনুরোধ করেননি কেন। এবাড়ির সত্যকার মালিক তিনি নন, তাঁর স্ত্রী। প্রকাশের মতন একজন প্রফেসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যিনি নিতান্তই নারাজ।

একটু পরেই দাক্ষায়ণী বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে, প্রতিমা।

তার এখানে থাকা মায়ের অভিপ্রেত নয় বুঝে প্রতিমাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপাকে নিয়ে উঠে গেল।

দেবেনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, বাঁচলাম। ছোকরা একটা নুইসেন্স—লোকের গোঁফ পুড়িয়ে দেয়।

প্রকাশ বলল, লোকটি বড্ড খেলো ধরনের।

নানা কারণে দেবেনবাবু অতনুকে পছন্দ করতেন না। সে যে শুধু বাঁচাল তাই নয়, তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে সে অস্বীকার করে এবং দাক্ষায়ণীর সুরে সুর মিলিয়ে বলে, সাহিত্যই ওঁকে মাটী করে দিয়েছে!

দেবেনবাবু বললেন, খেলো না হ'লে আর সাহিত্য-বিরোধী হয়? অথচ প্রতিমার মা ছোকরার সঙ্গেই প্রতিমার বিয়ে দিতে চান।

প্রকাশের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বলল,—ওর সঙ্গে!

—হ্যাঁ।

প্রকাশ বলল, ইম্‌পসিবল্‌।

দেবেনবাবু বললেন, ঠিক বলেছ প্রকাশ—এ অসম্ভব। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে—আমার সঙ্গে একমত হবেই তো!

দু'জনের এতটা ঐক্যমত হয়ত আর কোনা বিষয়েই সম্ভব হ'তনা।

দেবেনবাবু বললেন, আমার স্ত্রী কাল তোমায় ফোন্ করতে বললেন। অতনু আসবে জানলে তোমায় ফোন্ করতুম না।

—খবর দিয়ে ভালই করেছেন—তবু একবার দেখা হ'ল।

—তা বটে। কিন্তু আমার ইচ্ছ' ছিল একটা লেখাপড়ে শোনাই। লেখাটা সবে শেষ হয়েছে।

—বেশ, আর একদিন এসে শুনে যাব। কবে আপনার সুবিধে হবে, বলুন।

—পরে জানাব। আজ অতনু একটু আগে উঠেলেই পড়া হ'তো। —তারপর একটু থেমে দেবেনবাবু আবার বললেন, কিন্তু ও যত ঘনিষ্ঠতাই করুক, এ বিয়ে আমি হ'তে দেব না।

—কিছুতেই দেবেন না, মিঃ চক্রবর্ত্তী।

—কিছুতেই নয়! তুমি খুব নির্ভর যোগ্য লোক ; তাই তোমায় বললুম।

প্রকাশ বলল, আপনি নির্ভরযোগ্য মনে করেন সে আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু তার চোখের উপর ফুটে উঠল ঘটনার বাস্তব দিকটা। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে দেবেনবাবুর সঙ্কল্প কতটা কার্যকরী হবে, সে সম্বন্ধে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হ'ল! সে বলল, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী—

দেবেনবাবু বললেন, তিনি যতই বলুন, অতনু আমার জামাই —নেভার!

প্রকাশের চোখ হু'টো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে বলল, আপনার বিবেচনা শক্তি অতি গভীর!

—কিন্তু হুঃখের বিষয়, আমার স্ত্রীর পছন্দ যত সব চটকদার ইয়ংম্যান। যখনই প্রতিমার বিয়ের কথা ওঠে তখনই উনি ঐ ধরনের সব বিলেত ফেরতাদের নাম করেন। আমি কিন্তু এ-বিষয়ে বজ্রের মত দৃঢ়।

—দৃঢ়ই থাকবেন!

সেই রাত্রে দাক্ষায়ণী স্বামীকে বললেন, এই তোমার প্রকাশ মাস্টার ?

—মাস্টার নয়, প্রফেসর।

—ও একই কথা, ছোকরা দেখলাম টিকিধারী, একেবারে সে-কেলে ভূত।

দেবেনবাবু বললেন, টিকিটিতো খুব ছোট। ছেলেটির সুন্দর চেহারা, শান্তশিষ্ট স্বভাব।

—এ যুগে শান্তশিষ্ট স্বভাবের কোনো দাম নেই। আমি তো ওর কোনো ভবিষ্যতই দেখতে পাইনে।

—আমি প্রকাশের সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা পোষণ করি।

—তোমার যেমন আশা! একবার যখন সাহিত্য-রসিক হয়েছে তখন ওকে দিয়ে আর কিছু হবে না।

দেবেনবাবু বললেন, তুমি ওকে আসতে বলেছিলে কেন, বুঝতে পারলাম না তো!

—তোমার প্রশংসা শুনে বলেছিলুম। কিন্তু দেখে মনে হল, অচল।

কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলল। প্রকাশের সম্পর্কে স্ত্রীর ধারণার উন্নতি করতে না পেরে দেবেনবাবু নিরতিশয় দুঃখিত হলেন।

১২

মেয়ে মহলের উৎসবের রাতেই প্রতিমা ডায়েরীতে লিখল :—

আজ একটি নতুন ধরনের মানুষ দেখলাম। 'মেয়েমহলের' বার্ষিক উৎসবের সভাপতি, কদমছাঁটা চুল, গায়ে গলাবন্ধ জিনের কোট, মাথায় টিকি। বয়সে তরুণ হ'লেও মানুষটি যেন বিদ্যা-সাগরী যুগের। চেহারা সুন্দর বটে কিন্তু নিজেকে সুন্দর করে তুলে ধরবার আর্ট তাঁর মোটেই জানা নেই; এবং সেদিকে লক্ষ্যও নেই আদপে।

বক্তৃতা করার সময় যে লোক এতটা নার্ভাস হ'য়ে পড়ে, কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের সঙ্গতি রা'তে পারে না, প্রফেসর হিসেবে তাঁর এতটা সুখ্যাতি হল কি ক'রে, এইটেই আশ্চর্যের কথা।

দীপা আরও একটা অদ্ভুত খবর দিলে; প্রকাশবাবু অর্থাৎ সভাপতি মশায় নাকি সিনেমায় এক সুন্দরীকে দেখে প্রেমে পড়েছেন এবং ব্যায়াম সুরু করে দিয়েছেন ফ্যাট কমাবার জন্য। ব্যাপারটা হাস্যকর বটে।

পরদিনের ডায়েরীতে ছিল :—

আজও বিকেল থেকে পড়া হ'ল না। সন্ধ্যের পরই প্রকাশবাবু

এসেছিলেন। মা বাড়ী না থাকায় চা তৈরীর ভার পড়ল আমার উপর।

প্রকাশবাবু প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে বাবার লেখা শুনলেন। শুনতে শুনতে কয়েকবার আমার দিকে তাকালেন। পুরুষরা অনেকেই এমনিভাবে তাকায়, কিন্তু ধরা পড়ে তারা কম এবং ধরা পড়লেও এর মত নার্ভাস হয়ে যায় না।

মা আজ একটা কুকুর কিনেছেন! আর নাম রাখা হয়েছে সিবাষ্টোপোল, কুকুরটা দেখতে বাঘের মত। গায়ের রঙ্ কালো, গলার স্বর গম্ভীর। তার চোখ দু'টো দেখলে পরিচিত একজন পলিটিক্যাল লীডারের কথা মনে পড়ে।

দুপুরে বিদেশী একটা গল্প পড়েছি, 'ষ্টোভ'। ঘটনা খুব সামান্য, কিন্তু গাঁথুনী ও পরিবেশন খুবই চমৎকার।

তাদের বিবাহ হ'ল কোর্টশিপ্ করে, ওদেশে যা হয়ে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই স্বামী-স্ত্রীতে মন কষাকষি সুরু হল একটা ষ্টোভ নিয়ে। স্বামী মনে করেন, জিনিসটার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্ত্রীর বিশ্বাস, তাঁর সুখ, শান্তি এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত নির্ভর করছে ঐ ষ্টোভের উপর।

গল্পটা মনের উপর ছাপ রেখে গেছে।

প্রকাশ আজ আসবে শুনে প্রতিমা দীপাকে ফোন্ করেছিল: আজ বিকেলে একবার এস ভাই?

—কেন?

—কারণ আমি বলব না, কিন্তু তোমায় আসতে হবে।

—আচ্ছা যা'ব। দাদাও বলছিলেন একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আজ ক্লাশের আর কেউ আসবে নাকি?

—ক্লাশের কেউ নয়, তবে আসবেন একজন। তোমার দাদার বন্ধু—প্রাকাশবাবু।

দীপা বলল, দাদা বলেন, তিনি নাকি তোমাদের ওখানে আজকাল ঘনঘন যাতায়াত করছেন।

—খবরটা ঠিক নয়! এসেছিলেন মাত্র একদিন, বাবার প্রবন্ধ শুনতে।

—মাত্র একদিন বুঝি? দাদা বলছিলেন, ক'দিন তোমাদের খবর না পেয়ে প্রকাশদা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রতিমা বলল, তোমার প্রকাশদা একজন বদ্ধ পাগল।

দীপা বলল, ভাল কথা! উনি ব্যায়াম্ সুরু করেছেন কাকে দেখে জান তো?

—আমি জানব কি ক'রে?

—আমি কিন্তু জানি! সে হ'ল আমাদের প্রতিমা চক্কোত্তি!

—ননসেন্স্!

—প্রকাশদা যে দাদাকে বলেছে!—যাক তুমি কিছু আরম্ভ করনি?

—তার মানে?

—ব্যায়াম না হোক—অন্য কিছুর চর্চা?

—হ্যাঁ, ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখব ভাবছি।

—তোমার কণ্ঠস্বর কি বলছে জান?

—থাক, আর ফাজলামো করতে হবে না। আজ এস নিশ্চয়।

দীপা ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু প্রতিমা তার সঙ্গে বেশী কথাবর্তা বলার সুযোগ পায়নি। তবে দীপার কাছ থেকে জানল যে, প্রকাশের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল, তাকে ধনীর পর্যায়েই ফেলা যায়। ও রকম চরিত্রবান ইয়ংম্যান্ও আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না।

সেদিনের আসরে দীপা ও প্রকাশের সঙ্গে তার মা বরাবরই বেশ দূরত্ব রক্ষা করে চলায়, প্রতিমা বেশ-লজ্জা বোধ করল।

সে ডায়েরীতে লিখল :—

আজ দীপার সঙ্গে মা'র ব্যবহারে লজ্জিত হয়েছি। আর দুঃখ হচ্ছে প্রকাশবাবুর জন্যে। তিনি ডাঙার মাছের মতন বরাবরই একটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

মা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অতনুর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেনই! তাঁর ধারণা বিলেত না গেলে কেউ মানুষ হ'তে পারে না!

কিন্তু বিলেত-ফেরতের নমুনা যদি অতনু ব্যারিস্টার হয়, তাহ'লে ভগবানকে বলব, রক্ষে কর!

দীপা আজও সেই ব্যায়ামের কথার পুনরাবৃত্তি করল।

আলাপ নেই, পরিচয় নেই অথচ একটি শিক্ষিত তরুণ একটি মেয়েকে দেখে ডন কুইক্সো ব'নে গেল, এ যেন মধ্য যুগের কাহিনী। এ্যাটমের যুগে এটা একান্তই হাস্যকর।

কিন্তু ডায়েরীতে দেখলাম, তারিখটা মিলে যাচ্ছে। যে দিনের কথা দীপা বলছে, তার আগের দিনই বাবা এবং মার সঙ্গে আমিও বায়স্কোপে গিয়েছিলাম।

আমার পাশেই ছিল প্রকাশবাবুর সীট।

প্রতিমার রোজনাম্চার খবর প্রকাশ জানত না। জানলে তার মন নিশ্চয়ই হালকা হয়ে যেত!

১৩

দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে প্রকাশ খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে ক্ষিতীশকে বলল, ভাই, ভরসা আর কিছু নেই।

এর মধ্যে ভৃগুলাঞ্ছন তার টাকায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ঘরভাড়া করে 'ভৃগু জ্যোতির্বিদ্যা মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে গিয়ে প্রকাশ বলল, আপনার তাবিজ-কবচ চোলাই লামা ও ভৃগু—সবই বৃথা হ'ল।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, স্থৈর্যই ব্রহ্মা, প্রকাশবাবু। কিছুদিন

অপেক্ষা করুন, আপনাদের দু'জনের মিলনে স্বয়ং রাহুও বিঘ্ন ঘটাতে পারবেন না।

কিন্তু প্রকাশের জন্য আরও একটি আঘাত প্রস্তুত হয়ে ছিল, এবং সে আঘাত এল অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে।

হলধর দৌহিত্রকে ডেকে বললেন, দুনিয়াটা অল্ রট্, প্রকাশ।

প্রকাশ দাদুর সঙ্গে একমত হ'তে পারল না। দাক্ষায়ণী এবং পালপাট্টাওয়ালা এ সংসারে আছে বটে কিন্তু প্রতিমা এবং দেবেন-বাবুও তো আছেন! অতএব পৃথিবীটাকে অল্ রট্ বললে চলবে কেন?

হলধব বললেন, তুমিই বস অল রট্ কি না, উট্রাম?

উট্রাম ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে প্রভুর কথায় সায় দিল।

গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে হলধর টেবিলের উপর থেকে এক-খানা কাগজ টেনে নিয়ে বললেন, এই লোকটাকে জেলে দেওয়া উচিত!

প্রকাশ বলল, কাকে?

—এই সাহিত্য-তস্করকে। পড়ে ছাখ!—বলে তিনি দৌহিত্রের হাতে দিলেন 'তাণ্ডবের' একটি সংখ্যা। কভারের পরের পাতায়ই প্রকাশ দেখল, বড় বড় টাইপে ছাপা—'বিধিলিপি'—'ঘটকর্পর' রচিত!

ঘটকর্পর নামের পাশেই হলধর লাল কালি দিয়ে লিখেছেন, জেইল এণ্ড ফাইন বোথ!—প্রকাশকে বললেন, তোমাব মুখ দেখে মনে হচ্ছে, লোকটাকে তুমি চেন।

ঘটকর্পরই যে প্রতিমার বাবা, সে-কথা বলতে প্রকাশের সাহসে কুলল না। সে বলল, হ্যাঁ, আলাপ আছে!

—লোকটা এক নম্বরের চোর, স্কাউণ্ড্রেল!

প্রকাশ বললো, তিনি একজন বিশিস্ট ভদ্রলোক!

—তাই আমার পুঁথি চুরি ক'রে গবেষক সেজেছেন?

—তিনি হয়ত অন্য জায়গা থেকে কপি জোগাড় করেছেন।

—করলেই হ'ল? এর একটা মাত্র কপি ছিল তরুণের কাছে। সেইটে আমি কিনেছি।

প্রকাশ কোনো উত্তর করল না।

হলধর বললেন, চুরি ক'রে লোকটার গবেষক হওয়ার সাধ হয়েছে। উট্রাম, একবার পেনাল কোড্‌খানা নিয়ে এস তো! আমি তোমায় বলিনি প্রকাশ, বাংলা দেশ সাহিত্য-তস্করে ছেয়ে গেছে? আর বেশীরভাগ চোর হচ্ছে ঐ গবেষকের দল!

প্রকাশ বলল, আমি কালই ঘটকর্পর মশাইর সঙ্গে দেখা করে একটা ব্যবস্থা করব।

—বেশ, তাহলে জেনে নেবে কোথায় তিনি বই পেলেন, কে তাঁর কাছে বেচেছে। তাঁকে বোলো, আমি একজন রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শীগ্রই 'জাষ্টিস্ অব্ দি পিস্' হ'ব। তার মতন স্কাউ—

—দাতু, তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র!

—চোরকে শ্রদ্ধা! তোমার দ্বারা কিছু হবে না। আমারই যেতে হবে দেখচি।

প্রকাশ অনুনয়ের সুরে বলল, আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি এখন যে'য়ো না। আমি যদি না পারি, তখন যা' হয় করো!

পরদিন প্রভাতেই প্রকাশ দেবেনবাবুকে ফোন্ করল, বিশেষ দরকারে আজই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই!

দেবেনবাবু বললেন, ভাল কথা।

তারপর কি যেন ভেবে আবার বললেন, তুমি একটু দাঁড়াও!

মিনিটখানেক কেটে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন;—তুমি না আমাকে বলছিলে প্রকাশ, কি যেন জরুরি কাজ আছে?

—হ্যাঁ, খুবই জরুরি!

দেবেনবাবু অন্য কারো উদ্দেশে যেন বললেন, শুনচ, প্রকাশের

কাজ খুব জরুরি!—তারপর প্রকাশকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, —তোমার কখন সুবিধে হবে?

—সন্ধ্যে-ছ'টায়।

দেবেনবাবু বললেন, প্রকাশের সুবিধে হবে সন্ধ্যে ছ'টায়।

এবার প্রকাশ স্পষ্ট শুনতে পেল দাক্ষায়ণীর কণ্ঠস্বর,—বিশেষ দরকার থাকলে সন্ধ্যে-ছ'টায় আসতে পারেন, বলে দাও।

ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় প্রকাশ দেবেন বাবুর বাড়ীতে গেল। তিনি সাদর অভ্যর্থনা করলেন: এই যে এস, প্রকাশ। তোমায় ক'দিন পরে দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে।

প্রকাশ আসন গ্রহণ করলে দেবেনবাবু ডাকলেন, সোব্‌রাতি, চা নিয়ে এস।

প্রকাশ আশা করেছিল, চায়ের জন্য দেবেনবাবু প্রতিমাকে ডাকবেন। সোব্‌রাতির ডাক পড়লে তার চায়ের স্পৃহা অনেকটা কমে গেল।

দেবেনবাবু বললেন, ফোনে বলেছিলে দরকারী কথা আছে। —কি ব্যাপার বল দেখি?

—পরে বলব।

—বেশ, তাই বলো। আমারও কাজ ছিল তোমার সঙ্গে!

—কি কাজ?

—তাণ্ডবে 'বিধিলিপি' নামে আমার একটা লেখা বেরিয়েছে।

—হ্যাঁ, জানি।

—জান? পড়েচ নিশ্চয়ই! হাইক্লাস লেখা, কি বল? ওঃ, পড়নি? তাহ'লে লেখকের নিজের মুখ থেকে শোনাই ভাল।

প্রবন্ধ শোনার মত মনের অবস্থা তার ছিল না, তবু প্রকাশ 'না' বলতে পারল না।

যে লেখা চুরির সম্পর্কে সে অনুসন্ধান করতে এসেছে, প্রকাশকে সেইটে শুনতে হ'ল দীর্ঘ পয়তাল্লিশ মিনিট ধরে।

প্রবন্ধটির বক্তব্য কি, সে সম্পর্কে তার কোনো খেয়ালই ছিল না। সে ভাবছিল প্রতিমার কথা, দাক্ষায়ণীর কথা, বই-চুরি সম্পর্কে মাতামহের ক্রোধ, এবং ঐরকম আরো কত কি! তবে এই বৃদ্ধ বয়সেও দেবেনবাবুর উৎসাহ দেখে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। কী অসাধারণ সাহিত্য-প্রীতি!

তিনি লেখাটা পড়ছিলেন আত্মস্থ যোগীর মতন।

এই নিরীহ ভদ্রলোক সম্পর্কে তার দাদু হীন ধারণা পোষণ করেন ব'লে প্রকাশ বেশ ব্যথিত হয়েছিল।

পড়া শেষ হ'লে দেবেনবাবু বললেন, তাণ্ডবের প্রভঞ্জন গড়গড়ি বলেন, আপনি একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের ধারাই পাল্টে যাবে। বাংলা প্রথম উপন্যাসের আবিষ্কারের গৌরব একটা দুর্লভ বস্তু। আপনি সেই গৌরবের অধিকারী। হেঃ, হেঃ,—তুমি কি বল, ইয়ং প্রফেসর?

অন্যমনস্কভাবে প্রকাশ বলল, হুঁ।

এই সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' তে দেবেনবাবু সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি বললেন, গড়গড়ি একজন মস্তবড় সমজদার। তাঁকে এখন সাহিত্যের ডিক্টেটার বললেই চলে। আজ ফতোয়া দিচ্ছেন, 'দধীচি সবচেয়ে ভাল লেখক।' লোকে তাঁকে মেনে নিল। কাল বললেন, 'না, হে—লেখক হিসেবে বড় ঐ ভজরাম। ভজ শরৎবাবুকেও হারিয়েছে!'

প্রকাশ বলল, গড়গড়ির নাম শুনেচি।

—শুনবে বৈ কি! কাগজে কাগজে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ বেরুচ্ছে। সভা-হুজুগেদের মধ্যে যেন কম্পিটিশান্ লেগে গেছে—আগে কে তাঁকে নিয়ে সভাপতির তক্ততাউসে বসাবে! অথচ এই গড়গড়িই সাহিত্যজগতে একদিন প্রবেশ করেছিলেন কম্পোজিটার হিসেবে।

প্রকাশ বলল, তা'হলে তো ভাগ্যবান পুরুষ বলতে হবে!

—নিশ্চয়।

দেবেনবাবু নিজের সাহিত্য-প্রতিভা ও গড়গড়ির সুখ্যাতি ক'রেই চলেছেন, প্রকাশকে কথা বলার কোনো অবকাশই দেননি।

স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করলেও প্রকাশ 'বিধিলিপি'র প্রসঙ্গ অবতারণা করতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করছিল। কিন্তু কথাটা না তুলেও উপায় নেই।

দেবেনবাবু একটুক্ষণ চুপ করলে, ইতস্ততঃ করতে করতে প্রকাশ বলল, এই লেখাটা সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছিলাম।

—বেশ, বেশ, আলোচনা করা যাক। কেরী সাহেব বাংলা বই ছাপবার অনেক আগে এই 'বিধিলিপি' লেখা হয়েছিল।

—আপনি বইখানা পেলেন কোথায়?

—খুব একজন ভাল লোকের কাছ থেকে পেয়েছি। দুষ্প্রাপ্য বই যোগাড় করতে লোকটি সিদ্ধহস্ত, যদিও নিজে সে একজন সাহিত্য-রসিক নয়।

—লোকটি কে?

—আমার শ্বশুর মশায়ের দেশের লোক, তাঁদেরই প্রজা।

—তার নাম?

—উদয়রাম হাটি।

—উদয়রাম!

—হ্যাঁ, চেন তাকে?

প্রকাশ বলল, সে আমাদের বাড়ীতেই—

দেবেনবাবু বললেন, খাসা লোক। আমার কাছে সে আরো অনেক বই বেচেছে।

—কি কি বই?

—পুরনো পুঁথি।

প্রকাশ বলে উঠল, স্কাউণ্ড্রেল!

—কেন বল দেখি ?

—সে আমাদের বাড়ীতেই থাকে। আমার মাতামহের পুরনো পুঁথি সংগ্রহের বাতিক আছে।

—বাতিক ব'ল না প্রকাশ! তা'হলে আমারও তো—

—ক্ষমা করবেন। আমি সেভাবে কিছু বলিনি।

—বেশ, বেশ। সাহিত্য সেবা হচ্ছে অতি উঁচুদরের জিনিস।

প্রকাশ বলল, আমার দাত্বর পুঁথি চুরি করে আপনার কাছে বেচেছে!

—বড় ঘৃণিত ব্যাপার ত! আমি লোকটিকে এতদিন ভালই মনে করতাম। এখন দেখচি সে প্রথম শ্রেণীর জোচ্চোর!

একটু থেমে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার মাতামহের নাম ?

—হলধর চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাত্বর।

—নিশ্চয়ই তিনি একজন গবেষক ?

—হ্যাঁ।

—তা না হ'লে পুঁথি সংগ্রহ করবেন কেন! তিনি দেখচি রিমার্কেবল্ লোক!

প্রকাশ বলল, তিনি একজন রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। রিটায়ার করার পর আজ প্রায় দশ বছর বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

দেবেনবাবু বললেন, আমি তাঁর চাকরের কাছ থেকে চোরাই মাল কিনি জানলে তিনি কি ভাববেন! যদিও আমি কিনেছি নিতান্ত সরল বিশ্বাসে।

—আমি তা বুঝতে পেরেছি বটে, কিন্তু 'বিধিলিপি' চুরি যাওয়ায় তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

—হবারই কথা, আমিও হতাম! তুমি তাঁকে বলো, এজন্য আমি খুবই লজ্জিত। তিনি নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝবেন। আমার

সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ আছে ত! সোল-এর এফিনিটি! উভয়েই আমরা ব্রাদার গবেষক।

প্রকাশ বলল, হ্যাঁ, বুঝবেন বৈ কি।—একটু থেমে সে আবার বলল, বিধিলিপির সম্পুর্ণ কপি আপনি পেয়েছেন?

—এতদিন সবটা পাইনি। তোমাকে প্রাইভেটলি বলছি—আমার ব্যক্তিগত অবস্থা তত স্বচ্ছল নয় তাই সব টাকা আগে দিতে পারিনি। কাল উদয়রাম বইখানার অবশিষ্ট অংশ নিয়ে এসে বললে, যা পারেন দিয়ে দিন—আমি বইয়ের বাকীটা রেখে যাচ্ছি। আজই আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

প্রকাশ বলল, শুধু শেষাংশ পেয়েই আপনি বইখানার উপরে প্রবন্ধ লিখেছেন?

—তুমি আমার লেখাটা ভাল ক'রে শোননি দেখচি! ওতে প্রথমেই আছে—বইখানার সম্পুর্ণ পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়নি। যতটুকু পেয়েছি, তার উপর ভিত্তি করেই প্রবন্ধটি রচিত। তাতে বাংলার তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক রূপ চিত্রিত হয়েছে। বইখানির এই অংশ পড়লেই সেকালের বাংলার ছবি যেন চোখের উপর ভেসে ওঠে। গ্রন্থের আরবী, ফারসী ও ওলন্দাজী শব্দবহুল ভাষা সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

প্রকাশের মনে হল, দেবেনবাবু বড়ই ভালমানুষ কিন্তু সত্যই বাতিকগ্রস্ত। ঠিক তার দাদুর মত। সে জিজ্ঞাসা করল,—আপনি আর কি কি বই কিনেছেন উদয়রামের কাছ থেকে?

—বাংলার প্রথম স্যাটায়ার 'হিড়িম্বার প্রেম'—প্রথম নাটক 'প্যাঁজ ও পঁয়জার'। বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগেরই প্রথম পুস্তক আবিষ্কার করা আমার লক্ষ্য।

—আমার দাদুরও তাই!—তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে প্রকাশ বলল, 'হিড়িম্বার প্রেম' এবং 'প্যাঁজ ও পঁয়জার'ও তিনি

কিনেছিলেন। সে দু'খানা যে খোয়া গেছে আমরা তা' জানতাম না।

দেবেনবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে টেবিলের উপর কিল মেরে বললেন, বল কি! উদয় সে দুখানা যে বেচে গেছে আজ প্রায় তিন মাস আগে! ঘোর ষড়যন্ত্র!

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, তোমার দাদুর যে যে পাণ্ডুলিপিগুলো হারিয়েছে তার একটা তালিকা দিও তো?

প্রকাশ বলল, হ্যাঁ দেব। উদয়রাম আপনাকে বলেছে দেশে যাবে?

—হ্যাঁ, ওর স্ত্রীর অসুখ।

—ও তো বিয়েই করেনি!

—তা'হলে বল, লোকটা একেবারে ধাপ্পা-সম্রাট?

প্রকাশ বলল, উদয় কবে যাবে বলল?

—কালই তো যাবার কথা ছিল। যায়নি?

—না!

দেবেনবাবু বললেন, তা'হলে রায়বাহাদুর খুবই রাগ করেছেন?

রাগ করারই কথা। প্রকাশ জানত, তার মাতামহ শুধু রাগই করেননি, একেবারে ক্ষেপে গেছেন। তবুও প্রতিমার কথা ভেবে বলল, আমি তাঁকে খুব বুঝিয়ে বলব'খন। তিনি মানুষটি খুব উদার ও বিবেচক। আপনার প্রতি আমার দাদুর অশ্রদ্ধার ভাব দেখলে পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে ব্যথিত হ'ব।

দেবেনবাবু চেয়ার ছেড়ে প্রকাশের দুই হাত ধ'রে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললেন, তুমি একটি জুয়েল, প্রকাশ! তোমার মতন ছেলের কাছে যদি—

—যদি কি?—প্রকাশ ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করল।

দেবেনবাবু বললেন, সে কথা এখন থাক!

তাঁর এই ইঙ্গিতে প্রকাশ ভক্তিভরে দেবেনবাবুর পদধূলি নিয়ে

বলল, আশীর্বাদ করুন, যেন আপনার স্নেহের যোগ্য হ'তে পারি।

দেবেনবাবু বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! তোমার দাতুকে বলে কালই আমায় ফোনে জানিও। তবে দেখ প্রতিমার মা যেন টের না পান্! অবশ্য এটা খুব প্রাইভেটলি বলছি—সাহিত্যে ওঁর কোনো টেস্ট নেই। উনি হচ্ছেন প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ধরনের মানুষ।

বিদায় নেবার সময় প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল—আপনার বাড়ীর এঁরা সব ভাল আছেন তো?

—কা'র কথা বলছ?

—প্রতিমা ও তার মা!

—হ্যাঁ, তাঁরা ভাল আছেন।

—বেশ, বেশ—ব'লে প্রকাশ বেরিয়ে গেল বটে কিন্তু বাড়ী ফিরল একটা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।

প্রতিমা যে একবারও তার সামনে আসেনি, তার পেছনে নিশ্চয়ই দাক্ষায়ণীর হাত আছে! তিনি কি তাদের দেখাসাক্ষাৎ একেবারেই বন্ধ ক'রে দিতে চান?

১৪

বাড়ী ফিরে ফটকের সামনেই উদয়রামকে দেখে প্রকাশের মুখে একটা তীব্র বিরক্তির ছাপ পড়ল।

উদয়রাম বলল, তুমি খুব রেগে গেছ না?

প্রকাশ বলল, এখনও তুমি দেশে যাওনি যে?

উদয়রাম বলল, দেবেন বাবু সব বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

তারপর উভয়েই নীরব। প্রকাশের মনে হ'ল, মানুষ এতটা নেমে যায় কি করে যে তার লজ্জার বালাই টুকু পর্য্যন্ত আর থাকে না!

খানিকটা পরে উদয়রাম বলল, ভেবেছিলাম চলে যাব, কিন্তু—

প্রকাশ বলল, দাদাবাবু যদি জানতে পারেন যে তাঁর পুঁথিগুলি দেবেনবাবুর কাছে তুমিই বেচে দিয়েছ, তা হলে কি হবে বল দেখি?

—তিনি জানলে আর রক্ষে থাকবেনা জানি, কিন্তু জানতে তাঁকে দেওয়া হবে না।

—তাকি সম্ভব?

—সেই ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। তিনি জানলে তৎক্ষণাৎ আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

প্রকাশের মনে হল উদয়রাম তার মদের অভ্যাসের কথাই ইঙ্গিত করছে। মদের জন্যই হয়ত এবাড়ী ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

উদয়রাম বলল, আজ আমি বুড়ো হয়ে গেছি। যখন আমি প্রথম এখানে আসি তখন তুমি ছিলে এতটুকু। তোমাকে কি ভাবে মানুষ করেছি হয়ত তা তোমার মনে নেই। তবে—

তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতা প্রকাশের হৃদয় স্পর্শ করল। মনে পড়ল বাল্যের বহু স্মৃতি।

প্রকাশের মার শরীর ভাল না থাকায় তার তত্বাবধানের ভার ছিল দাস দাসীর উপর। কিন্তু তাদের পরিচর্যায় উদয়রামের মন উঠত না। সে নিজের হাতে তাকে স্নান করিয়ে তার চুল আচড়াত, সিঁথি কেটে দিত।

একবার উদয়রামের গ্রাম থেকে কয়েকটি যুবক কলকাতায় বেড়াতে এসে একবেলার জন্য হলধরবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। তারা খেতে বসলে, উদয়রাম ভুল করে তাদের একজনকে বার দুই তিন 'প্রকাশ' বলে ডাকে। ভুল করেও সে ভাবত প্রকাশের কথা।

প্রকাশ চেয়ে দেখল উদয়রামের চোখ বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠেছে।

একটু পরে সে বলল, দেবেনবাবু অত্যন্ত ভাল মানুষ লোক। তাঁর সম্মান যাতে বাজায় থাকে সেদিকেও তুমি একটু লক্ষ্য রেখ।

প্রকাশ বলল, তিনি ভাল লোক তা জানি।

উদয়রাম বলল, তুমি তাঁর মেয়ে প্রতিমাকে ভালবাস! আমাদের দেখতে হবে যাতে তিনি অসন্তুষ্ট না হন।

প্রকাশ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে; কে বললে তোমায়?

—ওকথা বলতে হয় না। ধরন ধারণেই লোকে বুঝতে পারে।

প্রকাশের মনে হল কি লজ্জার কথা। হয়ত আরও অনেকের কাছেই সে ধরা পড়েছে।

উদয়বাম বলল, তোমার দাদাবাবুকে জানি আজ বাইশ বছর। তিনি যদি জানতে পারেন যে দেবেনবাবু আমার কাছ থেকে তাঁর বইগুলো কিনেছেন তাহলে এমনই চটে যাবেন যে, প্রতিমার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব পর্য্যন্ত কানে তুলবেন না।

প্রকাশ বলল, দেবেনবাবু তো সরল বিশ্বাসে কিনেছেন।

তোমার দাদু ছিলেন হাকিম। হাকিমদের কাছে সরল বিশ্বাসের কোন দাম নেই, তাঁরা কাজ করেন আইন মাফিক। দেবেনবাবু অন্য কারও কাছ থেকে পুঁথিগুলি কিনলে সরল বিশ্বাসের কথা তবু উঠতে পারত। কিন্তু আমি এর মধ্যে আছি জানলে তোমার দাদাবাবু ভাববেন দেবেনবাবুই ষড়যন্ত্র করে এসব করিয়েছেন।

কথাগুলি প্রকাশের মনে লাগল। সে বলল, এখন উপায়?

উদয়রাম বলল, দেখি। তুমিও ভাব।

—দাদবাবু কি ঘুমিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

প্রকাশ একটি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। যাক, আজ অন্তত তার সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলতে হবে না।

রাত্রে অনেক কথাই তার মাথার মধ্যে ভিড় করতে লাগল। দেবেনবাবু পুঁথিগুলি কোথায় পেলেন সে সম্বন্ধে তাকে একটা মিথ্যা

কথার সৃষ্টি করতে হবে। তিনি হয়ত তা' সমর্থন করবেন না। আবার করলে ও তার দাদু তা' অবিশ্বাস করতে পারেন।

তারপর দাক্ষায়ণীর কথা। আজই তিনি প্রতিমাকে তার সামনে আসতে দেননি। পুঁথির ব্যাপার নিয়ে তাঁর স্বামী ও হলধরবাবুর মধ্যে গোলমাল বেঁধেছে জানতে পারলে দাক্ষায়ণী তার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করে দেবেন।

সর্বোপরি প্রতিমা। তার বাবার কাজের উপর গোয়েন্দাগিরি সে কখনও ক্ষমা করবে না!

ব্যাপার ক্রমেই এত জটিল হয়ে উঠছে যে ভাবতে গেলে মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব। এ অবস্থায় একমাত্র নির্ভর ভবিষ্যতের উপর। কালস্রোতে ঘটনার ধারা হয়ত আবার অনুকূল পথে যাবে!

এই সব সাত পাঁচ ভেবে এই রাত্রে প্রকাশ আর ঘুমোতে পারল না। ভোরের দিকে তন্দ্রার ঘোরে দেখল, প্রতিমা অতনুর সঙ্গে মোটরে বেড়াতে বেড়িয়েছে।

প্রকাশ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। তারপর কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এক চুমুকে তা' নিঃশেষ করে বলে,—আঃ!

১৫

পরদিন হলধরের ঘুম ভাঙল বেলা প্রায় দশটায়। তিনি মাথায় একটা চিন্‌চিনে বেদনা বোধ করছিলেন, মুখে ক্লান্তির ছাপ্।

প্রকাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি ডাকলেন,—উট্রাম, একটা পেগ্।

রাত্রের খোঁয়ারি ভাঙবার জন্য আজকাল রোজই সকালে তাঁর দরকার হয় একটা বড় পেগ্ হুইস্কির।

প্রকাশ খবরের কাগজ পড়ছিল, হলধর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন —গিয়েছিলে সেই চোরের কাছে?

প্রকাশ বলল, ঘটকর্পর মশাইর কথা বলচ? তিনি তো চোর নন্!

—অল্ রট্! তুমি এন্কোয়ারী করতে গিয়ে বুঝি এই আবিষ্কার করলে?

প্রকাশ বলল, ঘটকর্পর যে চোর নন্, একথা জোর করে বলতে পারি।

—হেঃ, হেঃ, বই চোরকে তুমি সাধু মনে করতে পার, কিন্তু পেনাল কোড অন্য কথা বলে।

এই সময় উট্রাম বোতল ও গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল।

প্রকাশ বলল, তিনি তোমার পাণ্ডুলিপি সরল বিশ্বাসেই কিনেছেন।

—অল্ রট্! সরল বিশ্বাস কোনো ডিফেন্সই হতে পারে না।

—ঘটকর্পর এর জন্য বিশেষ দুঃখিত।

হলধর শ্লেষপূর্ণ স্বরে বললেন, অতএব আমিও বাধিত হয়েছি!

একটু পরে প্রকাশ বলল, এ সম্পর্কে তুমি কি করতে চাও?

—মামলা করতে চাই। আমার বিশ্বাস, শুধু এই লেখাই নয়, পরের লেখাও চুরি ক'রে সে চালায়!

প্রকাশ বলল, তিনি সরল বিশ্বাসে ক'খানা বই কিনেছেন, অথচ তুমি ভদ্রলোককে অবিশ্বাস করচ!

হলধর যেন আকাশ থেকে পড়লেন; বললেন, ক'খানা বই! তার মানে? লোকটা আমার আরো কতকগুলো পাণ্ডুলিপি চুরি করেছে বুঝি? যা' অনুমান করেছিলাম তাই দেখছি ঠিক। ঘটকর্পর ইজ এ ডাউন্ রাইট রোগ!

উট্রাম দেখল, প্রেমিকার পিতার সম্পর্কে মাতামহের এই অপমান জনক উক্তি শুনে প্রকাশ রাগে ফুলে উঠছে। সে প্রকাশ-কে সংযত হ'তে ইশারা করল।

হলধর জিজ্ঞাসা করলেন,—আমার আর কি কি বই চুরি করেছে সে ?

বার-কয়েক মাথা চুলকিয়ে নিয়ে প্রকাশ বলল, তাঁর আলমারিতে দেখলাম 'প্যাঁজ ও পঁয়জার' আর 'হিড়িম্বার প্রেমের' পাণ্ডুলিপি।

—মাই জুয়েল অব ঘটকর্পর—ব'লে হলধর গর্জন করে উঠলেন।

প্রকাশ ও উট্রাম ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করার জন্য চুপ ক'রে রইল।

মিনিট তিনেক পরে হলধর বললেন, তুমি লোকটার জন্য এত ওকালতি কেন করচ বল দেখি প্রকাশ ?

—তিনি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি!

—তোমার যখন তার উপর এত শ্রদ্ধা, তখন এর ভার আজ থেকে আমিই নিলাম!

—ক্ষমা কর দাদু! আমার উপর সব ছেড়ে দাও, যা হয় আমিই করব!

—তোমাকে দিয়ে হবে না।

—জীবনে আর কোনো অনুরোধ তোমায় করব না, কিন্তু এইটে—

—হুঁ, ঘটকর্পর দেখচি তোমার বিশেষ অন্তরঙ্গ। বেশ, তোমার উপরই ভার দিলাম, কিন্তু আমি যা চাই, তাকে দিয়ে তাই করাতে হবে।—বলেই তিনি আঙুলের কর গুণে গুণে বলতে আরম্ভ করলেন, নাম্বার ওয়ান—আমার পুঁথিগুলো সব ফেরত দিতে হবে। নাম্বার টু—কাগজে কাগজে স্বীকারোক্তি করতে হবে যে, 'বিধিলিপি' প্রবন্ধটি রায় বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হয়েছে। নাম্বার থ্রি—যার কাছ থেকে পুঁথিগুলো কিনেছে, তাকে ধরিয়ে দিতে হবে।

প্রকাশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, রায়বাহাদুর বললেন, এই

আমার শেষ কথা। তুমি এর ভেতরে না থাকলে আমি তাকে জেলে দিতাম। যেটুকু অনুগ্রহ করছি, সে শুধু তোমার খাতিরে!

প্রকাশ তাঁর অনুগ্রহের গভীরতা ঠিক উপলব্ধি করতে পারল না।

রায় বাহাদুর ডাকলেন,—উট্রাম, বারগাণ্ডি!

১৬

ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক, বাহুমূলে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, দোদুল্যমান শিখায় বাঁধা অপরাজিতা ফুল, পরিধানে সাদা গরদ, গায়ে ভৃগুলাঞ্ছিত নামাবলী—এ-হেন বেশে রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন রায় হলধর চট্টোপাধ্যায়ের মোটর থেকে নামলেন।

প্রকাশ এগিয়ে এসে ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিল।

জ্যোতিষীর ওষ্ঠপ্রান্তে সেই শাশ্বত হাসি। তিনি বললেন, কল্যাণমস্তু, ব্যাপার কি প্রকাশবাবু?

—ব্যাপার গুরুতর।

ভৃগুলাঞ্ছন প্রকাশের মুখের দিকে তাকালেন। সে বলল, ঝড় উঠেছে, ঠাকুরমশাই।

—কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার পিতা তো আপনাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন।

—তা দেখেন বটে, তিনি খুব মহাশয় লোক।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, শ্রদ্ধেয়া দাক্ষায়ণী দেবীর মত পরিবর্তনের জন্যে ভৃগু মতে পুরশ্চারণ করছি। সুফল সুনিশ্চিত। আর সেই ব্যারিস্টার পুঙ্গবের নাম তো অতনু রায়?

—হ্যাঁ।

—পুরশ্চারণে অতনুর নাম-ও প্রয়োজন হয়েছে কিনা।

প্রকাশ বলল, এবার ঝড় উঠেছে অপ্রত্যাশিতভাবে, আমার দাদুর দিক থেকে।

—তিনি তো খুব স্নেহপ্রবণ, বিশেষ ক'রে আপনার বেলায়।

—স্নেহপ্রবণ নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি মনে করেন দেবেনবাবু একজন—

—কি মনে করেন? ইতস্তত করছেন কেন?

—মনে করেন দেবেনবাবু অসাধু, এককথায় বলতে গেলে চোর।

—দেবেনবাবু তস্কর? কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার বাবা তস্কর? অসম্ভব।

—হ্যাঁ, অসম্ভব তা আমি জানি। কিন্তু দাদু ভীষণ রেগে গেছেন—ব'লে প্রকাশ জ্যোতিষীর কাছে আগাগোড়া সব খুলে বলল।

সব শুনে রামবাঞ্ছা একটু হেসে বললেন, এই কথা! এ তো জলবত্তরলং।

—আপনি এটা সহজ মনে ক'রলেন?

—কেন নয়? রায়বাহাদুরকে সব খুলে বললেই তিনি শান্ত হবেন।

—কি খুলে বলব?

—দেবেনবাবু না জেনে পুঁথি কিনেছেন।

—তা' বলেছি এবং এও জানিয়েছি যে দেবেনবাবু এর জন্যে আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু তাতেও আমার মাতামহ খুসী হননি। তিনি চান প্রকাশিত প্রবন্ধটির জন্যে দেবেনবাবু খবরের কাগজের মারফৎ তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন, অপরাধীর নাম বলবেন এবং বইগুলি ফিরিয়ে দেবেন।

—দেবেনবাবু কি বলেন?

—বই ফিরিয়ে দিতে রাজী আছেন কিন্তু ক্ষমা চাইতে এবং উদয়ের নাম প্রকাশ করতে তিনি অসম্মত।

—নাম প্রকাশ ক'রতে অসম্মত কেন?

—উদয়রাম আমাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে, তাই আমিও তার নাম জানাতে নিষেধ ক'রেছি। তা ছাড়া তিনি একজন লোকের অন্ন মারতে প্রস্তুত নন।

ভৃগুলাঞ্ছন একটু ভেবে বললেন, তা হ'লে একটি মাত্র পথ আছে। আপনার মাতামহকে বলুন যে প্রতিমাকে আপনি ভালবাসেন।

—আপনি দাছুকে চেনেন না। দেবেনবাবুর মেয়েকে ভালবাসি শুনলে তিনি আমায় ক্ষমা করবেন না।

ভৃগুলাঞ্ছন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা হ'লে দেখছি লামার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

—এখানে লামা পাবেন কোথায়?

—তিব্বতী শাস্ত্র অর্থে লামা শব্দ ব্যবহার করেছি। তাছাড়া আপনি তো জানেন আমি চোলাই লামার একজন শিষ্য।

—তাঁর শাস্ত্রে কি বলে?

—বলে খট্টাশী ধারণের কথা।

—খাটাশ ধারণ ? সেটা আবার কি?

—কস্তুরীর মতন একটা পদার্থ। আপনার মাতামহের গলায় সোনার মাছুলীতে ভরে খট্টাশী পড়িয়ে দিলে তিনি মত পরিবর্তন করবেন।

—প্রেমেচ খট্টশী। খট্টাশী প্রেমের অনুকূল পদার্থ।

—আমার মাতামহকে মাছুলী ধারণ করান ত ছুরের কথা, কবচ তাবিজের নাম শুনলেই তিনি রেগে যান।

—কিন্তু ধারণ করাতে পারলে সুফল নিশ্চিত।

—ধারণ করাতে পারলে তবে ত সুফল?

—কেন, গভীর রাত্রে নিদ্রাবস্থায় আপনি তাঁর কণ্ঠদেশে পরিয়ে দেবেন। পাঁচ মিনিট থাকলেই কার্যসিদ্ধি।

—বেশ তা না হয় করলাম। কিন্তু প্রতিমার মনের কথাটাও তো জানা দরকার।

—শ্রীমতীর মনোভাব, সে তো নিহিতং গুহায়াং।

—কি নিহিত?

—নারীর মনের কথা। তবে হোড়া দর্পণ মতে খটিকাপাত করলে তাও জ্যোতিষীর কাছে সুগম হয়ে যায়।

—বেশ, খটিকাপাত করুন।

ভৃগুলাঞ্ছন খট্টাশীর মাদুলী প্রস্তুত ও খটিকাপাতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন, এখন চরের প্রয়োজন।

—চর কিসের জন্যে?

—কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমা ও তার গর্ভধারিণীর মত জানবার জন্যে।

—প্রতিমার মত জানতে পারে আমার বন্ধু ক্ষিতীশের বোন দীপা। তার সঙ্গে প্রতিমার খুব ভাব। আর তার মায়ের মতামতের কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি। তিনি চান বিলেত-ফেরৎ জামাই।

—আচ্ছা, দেবেনবাবুর মতামত দ্বারা তাঁর স্ত্রীর মতামত কি মোটেই প্রভাবিত হয় না?

—হয়। দেবেনবাবু যাকে সাদা বলেন, দাক্ষায়ণী দেবী ধরে নেন সেটা কালো। দেবেনবাবু যেহেতু আমাকে পছন্দ করেন, সেই কারণেই তিনি আমাকে অপছন্দ করেছেন।

—তা হ'লে তো সুখী দম্পতী বলতে হবে।

ভৃগুলাঞ্ছনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যালোচনায় প্রকাশ এতই নিবিষ্টচিত্ত ছিল যে; দেবেনবাবু—যে দরজায় দাঁড়িয়ে তাও লক্ষ্য করে নি।

দেবেনবাবু ডাকলেন, প্রকাশ।

প্রকাশ তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বলল, আসুন, আপনি এখানে ?

—তুমি বোধহয় আমাকে দেখে বিস্মিত হ'চ্ছ ?

—না, না ?

—হবারই কথা, হলধরবাবু আমার উপর যে ধারণা পোষণ করেন তাতে—

প্রকাশ বলল, আপনি বসুন ; আপনার পায়ের ধুলো পড়ায়—

দেবেনবাবু বললেন, এলাম রায়বাহাদুরের সঙ্গে একটা খোলা-খুলি আলোচনা করতে।

প্রকাশ মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস তিনি বাড়ি নেই। মুখে বলল, তিনি তো হরিণঘাটা গেছেন। 'অল রায়বাহাদুর ডে'র উৎসবে।

ইনডিপেনডেন্স ডে, জালিনওয়ালাবাগ ডে, মে ডে, এই সব তো জানতাম, রায়বাহাদুর ডে'টা আবার কি জিনিস ?

—রায়বাহাদুরদের উৎসবের দিন। এই দিনে তাঁরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ করে থাকেন।

দেবেনবাবু একটু মুচকি হাসলেন। প্রকাশ তাঁর সঙ্গে ভৃগুলাঞ্ছনের আ াপ করিয়ে দিল। বলল, ইনি হচ্ছেন পণ্ডিত রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন, আর ইনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম-এ, বি-এল ; সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক।

দেবেনবাবু পাদপূরণ করলেন, এবং গবেষক।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, একটু আগেই প্রকাশবাবু আপনার কথা বলছিলেন।

দেবেনবাবু বললেন, বয়সের পার্থক্য থাকলেও আমাদের বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ়।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, উনি আপনার রচনার খুব পক্ষপাতী।

দেবেনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, প্রকাশ চিন্তাশীল লোক।

প্রকাশ বলল, ভৃগুলাঞ্ছন মশাইয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রগাঢ়। ইনি তিব্বতী, নেপালী, কাবুলী, ভৃগু সকল মতেই পারদর্শী।

—ওঃ, তাই উনি ভৃগুলাঞ্ছন! সেটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আপনার কোন্ বিষয়ে অধিকার বেশী—গণিত না ফলিত?

—আমি ভৃগু ও তিব্বতী মতের সমন্বয় ঘটিয়েছি।

—বাঃ বেশ। একটা কথা জিজ্ঞেস করি।—কাবুলী দাওয়াইয়ের কথা শুনেছি, কাবুলী জ্যোতিষটা কি রকম?

—আখরোটের উপর অঙ্কপাত করতে হয়।

—আপনি কররেখা বিচার করেন?

—হ্যাঁ।

দেবেনবাবু ডান হাতখানা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দয়া করে একটু দেখুন।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, কি করব, আয়ু না ধন বিচার? আপনি দীর্ঘায়ু।

—আয়ু আমি চাই না।

—আপনি ধনিক।

দেবেনবাবু নীরব।

—আপনি ভাগ্যবান।

—ভাগ্যের কথা ছেড়ে দিন। দেখুন—স্বাধীনতা?

—তার মানে?

—মানে, আমি ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলছি।

রামবাঞ্ছা বললেন, ওটা একটা ভূয়ো জিনিস। ব্যক্তিমাত্রেই পরনির্ভর।

—আমি বলছিলাম পারিবারিক স্বাধীনতার কথা।

ভৃগুলাঞ্ছন দেবেনবাবুর হাত দু'খানি একত্র করে একবার

খুললেন, একবার ভাঁজ করলেন ; তিনচার বার এইরূপ প্রক্রিয়ার পর তিনি বললেন, আপনি প্রেমের নিগড়ে বদ্ধ, গভীরভাবে।

-চির সংযমী দেবেনবাবুর মুখ দিয়েও বের হল—ড্যাম্ ইট্ !

পরমুহূর্তেই তিনি ক্ষমা চাইলেন—বড় অশোভন হয়েছে! আমার বন্ধনটা খুব কঠোর কিনা!

দ্রব্যমূল্য হ্রাস সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে যেমন কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায় না, দেবেনবাবুও তেমনি ভৃগুলাঞ্ছনের কাছ থেকে নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো কথাই বার করতে পারলেন না। একটু পরে দেবেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,— আচ্ছা, সাহিত্যিকও গবেষক হিসেবে আমার খ্যাতির সম্ভাবনা কিরূপ ?

—আপনি তো এর মধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। আপনার ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল!

দেবেনবাবু হৃষ্টচিত্তে টেবিলের উপর চারটি টাকা রেখে বললেন, এই আপনার যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। আপনি যখন প্রকাশের বন্ধু, তখন নিশ্চয়ই আপনার সাহিত্যের প্রতি প্রীতি আছে।

ভৃগুলাঞ্ছনের সবচেয়ে অভাব ছিল ঐ বস্তুটির ; কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে তিনি বললেন, বাঙালী মাত্রেই বাংলা ভাষাকে ভালবাসে, এটা তার গৌরবের বস্তু। কবি বলেছেন,

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!

দেবেনবাবু বললেন, দয়া করে তাহলে একটা লেখা শুনুন।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, সানন্দে।

আধঘণ্টা ধরে দেবেনবাবু ইংরেজী, বাংলা কোটেশন্ বহুল একটা রচনা পাঠ করলে ভৃগুলাঞ্ছন মত প্রকাশ করলেন, অতি প্রাঞ্জল আপনার রচনা। যেমন মধুর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তেমনি নট জনোচিত আবৃত্তি। মনে হয়, গো-মুখী থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্ছেন!

দেবেনবাবু সোৎসাহে বললেন, তাহলে আরেকটা পড়ি? তোমার কেমন লাগল, প্রকাশ?

প্রকাশ বলল, বেশ।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সে মোটেই আনন্দ লাভ করতে পারে নি। এ প্রবন্ধটাও হংসেশ্বরের 'হিড়িম্বার প্রেম' অবলম্বনে রচিত। প্রকাশের মনে হ'ল এ নিয়েই আবার একটা নতুন গোল-মালের সৃষ্টি হবে।

দেবেনবাবু বললেন, শোন তবে আমার একটা বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ধারা। এটা হ'ল চিন্তাধারা নম্বর সাত। আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে না ত ঠাকুর মশাই?

রামবাঞ্ছা বললেন, কিঞ্চিদপি ন!

দেবেনবাবু ভূমিকা করলেন, মাঝে মাঝে আমি চুপ করে বসে ভাবি, আর যা মনে আসে লিখে যাই। এগুলোর নামকরণ করেছি বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা। সবগুলোই ফিলজফিক্যাল। এখন যেটা পড়ব, তার নাম 'গর্দ্দভ'।

দেবেনবাবু পড়তে লাগলেন, গর্দ্দভ হচ্ছে বিশ্বের ভারবাহীদের প্রতীক। ভারবাহীর একটা দল যুগ যুগ ধরে চলে আসছে—এরাই হচ্ছে দুনিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কুলি-কামিন মুটে-মজুর—কবিগুরু যাদের উদ্দেশে বলেছেন—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—তারাই শুধু ভারবাহী নয়। আরো আছে একদল। কেউ আজীবন লিখল, কিন্তু লেখক হতে পারল না, কেউ চেঁচাল 'সা রে গা মা' বলে সারাজীবন কিন্তু সুর ধরা দিল না তার কাছে, একদল প্রেমে পড়ে সব বিসর্জন দিলে কিন্তু পেলো না প্রেমিকার একটু করুণা! এই রকম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ভারবাহী আছে। তারা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠই নয়, তারাই শতকরা নিরানব্বই জন।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, আপনার চিন্তাশক্তি অতি উঁচুদরের।

দেবেনবাবু একটু হাসলেন।

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, আপনি দার্শনিক।

দেবেনবাবুর হাস্যধ্বনি উচ্চগ্রামে উঠল।

তিনি বললেন, গুণীজনই গুণের মর্ম উপলব্ধি করেন। আপনি পণ্ডিত ব্য ক্ত।

—আমি এবং প্রকাশবাবু প্রায়ই আপনার সম্বন্ধে আলোচনা করি।

—করেন? উত্তম! প্রকাশ কি বলে?

—উনি বলেন, আপনি একজন মনীষী। শুধু আপনার নন্, উনি আপনার পরিবারের সকলেরই গুণগ্রাহী। আপনার স্ত্রীর, এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার।

দেবেনবাবু প্রকাশের দিকে তাকালে সে মাথা নীচু করল।

ভৃগুলাঞ্ছন বলে চলেন, প্রকাশবাবু বলেন, প্রতিমা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, সুশিক্ষিতা, নৃত্যকুশলা ও সঙ্গীত পটীয়সী।

—সবই সত্য। প্রকাশের মনোভাব আমিও লক্ষ্য করেছি।—বলে দেবেনবাবু একটু হাসলেন।

প্রকাশ ভাবল, বৃদ্ধ বলে কি। শুধু উদয়রাম নয়, ঐ সাদা-সিধে মানুষটার কাছে পর্যন্ত সে ধরা পড়ে গেছে! কী লজ্জার বিষয়!

ভৃগুলাঞ্ছন বললেন, লক্ষ্য করবেনই তো! আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

দেবেনবাব বললেন, আমরাও ওকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। আমি এবং প্রতিমা।

কথাটা প্রকাশের কানে যেন মধু বর্ষণ করল।

এই সময় উদয়রাম ঘরে ঢুকে প্রায় মেঝে পর্যন্ত মাথা নুইয়ে দেবেনবাবুকে প্রণাম করল।

দেবেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হাতীরাম! তুমি বাড়ী যাওনি দেখছি। কোন্ সাহাসে এসে আমার কাছে দাঁড়ালে?

উদয়রাম নীরব।

প্রকাশ বলল, আপনি উদয়দাকে ক্ষমা করুন। ও ছেলেবেলা থেকে আমায় মানুষ করেছে।

দেবেনবাবু বললেন, ওর অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। রায় বাহাদুরের কাছে ও আমাকে ছোট করেছে, চোর বানিয়েছে।

প্রকাশ উদয়রামকে বলল, তুমি এখন যাও তো, উদয়দা!

উদয় চলে গেলে প্রকাশ অনেক বুঝিয়ে বলতে, দেবেনবাবু কিছুটা শান্ত হলেন।

একটু পরে ভৃগুলাঞ্ছন বিদায় নিলেন। যাবার সময় প্রকাশকে একান্তে ডেকে বললেন, দেবেনবাবু বড় খাসা মানুষ, এঁর মেয়ে নিশ্চয়ই খুব ভাল হবেন।

—নিশ্চয়! ব্রাইটার দ্যান সান সাইন অ্যাণ্ড সুইটার দ্যান্...

—সেটা কি পদার্থ?

—ও কিছুনা!

সেই দিনই বিকেলে প্রকাশ উদ্রামকে ডেকে বলল, দেবেনবাবু দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাকে তাঁদের বাড়ীতে যেতে বলে গেছেন।

উদয়রাম বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।

প্রকাশ বলল, আমি তাঁকে সব বুঝিয়ে বলেছি। তিনি ক্ষমা করেছেন তোমায়। আর এই যাওয়ার অনুরোধটা তাঁর নিজের নয়। তাঁর স্ত্রীর। রাগ কমে যাওয়ার পর খবরটা দিলেন।

একটু থেমে সে আবার বলল, আচ্ছা, তিনি তোমায় যেতে বলেছেন কেন বল দেখি?

—বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক ব'লে তিনি আমাকে স্নেহ করেন। তাছাড়া যেতে হয়ত বলেছেন তোমাদের খবর নেওয়ার জন্য।

প্রকাশ সোৎসাহে ব'লে উঠল, চট্পট্ যেয়ো কিন্তু! আর, কি বলেন, আমাকে জানিও!

দেবেনবাবু গভীর মনোযোগ সহকারে প্রবন্ধ লিখছিলেন। টেবিলের এক পাশে বরফজলের একটা টামব্লার, বাঁ ধারে প্লেটে কতকগুলি খড়কের কাঠি।

উৎসাহের বন্যা যখন তাঁর সাহিত্যিক হৃদয়ের দুইকূল ছাপিয়ে ওঠে তখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখেন। কলম চলে গণেশের লেখনীর মত দ্রুতগতিতে।

বরফজল ও খড়কের কাঠি দেবেনবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান দু'টি উপকরণ। মাঝে মাঝে তিনি টামব্লার ধরে চুমুক দেন আর ভাবধারায় বাধা পেলেই কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে আরম্ভ করেন।

তাঁর দাঁতের শিরার সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ কতটা তা' অবশ্য বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য, কিন্তু এটা সত্য যে দাঁতের গোড়ায় খোঁচা লাগলেই দেবেনবাবুর রুদ্ধ ভাবধারা কলমের ডগায় মুক্তির সন্ধান পায়।

তাঁর লেখার সময় কারও, এমন কি প্রতিমার ও ঘরে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু দাক্ষায়ণী সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করতে তিনি কখনও সাহসী হননি। তবে সেদিক থেকে আশঙ্কাও বিশেষ কিছু ছিল না। স্বামীর সাহিত্য সেবার সঙ্গে দাক্ষায়ণী বরাবরই অসহযোগিতা রক্ষা করে চলে আসছেন।

কয়েকবার দাঁত খুঁচিয়ে এবং জল খেয়ে দেবেনবাবু সবেমাত্র চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠা লিখতে সুরু করেছেন এমন সময় দরজার কাছে শোনা গেল, দাক্ষায়ণীর কণ্ঠস্বর—

—কী আস্পর্দ্ধা, এত বড় সাহস।

দেবেনবাবু চমকে উঠলেন।

দাক্ষায়ণী বললেন, সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত।

দেবেনবাবু আজ লিখেছেন তের পৃষ্ঠা। আগে কতবার এক সঙ্গে কুড়িপাতাও হয়ে গেছে, তখন তো সীমার কথা ওঠে নি।

দাক্ষায়ণী বললেন, কী নির্লজ্জ।

তিনি ব্যস্ত সমস্তভাবে বললেন, এ্যাঁ তুমি ডাকছিলে বুঝি ?

দাক্ষায়ণী বললেন, অতনু একটা নচ্ছার প্রকৃতির লোক।

দেবেনবাবুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। তিনি আশ্বস্ত হয়ে বললেন, নিশ্চয়।

দাক্ষায়ণী আবার বললেন, অতনু একটা ধাপ্পাবাজ।

সোৎসাহে দেবেনবাবু বলে উঠলেন, স্কাউণ্ড্রেল। আমি তোমার সঙ্গে একমত তুখু।

দাক্ষায়ণী স্বামীকে ধমক দিলেন, আবার তুখু।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনের আনন্দে অনেক দিন পরে স্ত্রীকে সস্নেহে সম্ভাষণ করে পূর্বেই জিভ কেটেছিলেন। ধমক খেয়ে বললেন, না, না, ওটা ভুল হয়ে গেছে। অতনু অত্যন্ত খেলো ধরণের লোক।

—খেলো বললে তাকে সম্মান করা হয়। সে একটা ছুঁচো।

দেবেনবাবু সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে আপন মনে বললেন, না হলে আর লোকের গোঁফ পোড়ায়!

দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি করেছে জান ?

জানি না বললে বিপদ, আবার জানি বলাও চলে না। তাই দেবেনবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সহধর্ম্মিণীর মুখের দিকে তাকালেন।

দাক্ষায়ণী বললেন, কোন খবরই তুমি রাখবে না। যাকে জামাই করব বলে ঠিক করা হয়েছে, তার সম্বন্ধে মেয়ের বাবার আরও খবর নেওয়া উচিত।

দেবেনবাবু নীরব।

দাক্ষায়ণী আবার বললেন, অতনু দীপাকে নিমন্ত্রণ খাইয়েছে অথচ প্রতিমাকে বলেনি। কী অকৃতজ্ঞ!

দেবেনবাবু মন্তব্য করলেন, অকৃতজ্ঞতা ওর সহজাত।

—শুধু কি খাওয়ান! আজকাল মোটর বিহার ও চলছে।

—এতদূর!

—হ্যাঁ।

—তুমি জানলে কি করে?

—গোয়েন্দাগিরি করে জেনেছি। মেয়ের মা হলে অনেক খবরই তাকে রাখতে হয়। এ-তো আর সাহিত্য করা নয় যে সব জিনিষের দিকে চোখ বুঝে থাকলেই চলবে।

দেবেনবাবু কোন উত্তর করলেন না।

দাক্ষায়ণী বললেন, বুঝলে কালি-কলম দিয়ে কাগজের ওপর আচড় কাটার কুফল?

দেবেনবাবু কলমের আঁচড়ের অধিকতর কুফল জানবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য রেহাই পেল।

দাক্ষায়ণী বললেন, সেদিন দেখি অতনু, ক্ষিতীশ ও দীপা মোটরে বেরিয়েছে। তারপর দিন অতনুর ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব জানলাম।

দেবেনবাবু বললেন, অতনুর ভারী অন্যায়।

—অন্যায় শুধু কি তার? দীপার কথাও একবার ভাব দেখি। কী বেহায়াপনা? আলাপ হ'ল যার বাড়ীতে তাকে বাদ দিয়ে তুই কিনা গেলি ছুঁ‍ে টার সঙ্গে মোটর চড়তে!

দেবেনবাবু অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলে ফেললেন, মেয়েদের ধরনই ওই।

—কি বুদ্ধি তোমার? আমি কি মেয়ে নই—আমি কি অকৃতজ্ঞ না বেহায়া?

—না না সে রকম কিছু বলছি না।

দাক্ষায়ণী বললেন, ওটা .শক্ষার দোষ। এর জন্য দায়ী দীপার মা। করুক দেখি আমার মেয়ে এমন একটা অন্যায় কাজ।

দেবেনবাবু বললেন, প্রতিমা কখনও অন্যায় করতে পারে না।

দাক্ষায়ণী বললেন, কেন পারে না শুনি ?

দেবেনবাবু এবার মহাসঙ্কটে পড়লেন। মেয়ের প্রশংসা করেও রক্ষা নেই।

দাক্ষায়ণী হেসে বললেন, জানত' খনার বচন, মা ভাল ত মেয়ে ভাল।

—ওটা খুবই সত্যি কথা।

দাক্ষায়ণী বললেন, অনেকদিন অতনু এদিকে না আসায় আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তার যে পেটে পেটে এত বিদ্যে তা কল্পনাও করিনি।

দেবেনবাবুও ভেবেছিলেন অতনু আর আসবে না। অবশ্য তার কারণ অন্যরূপ।

একদিন দাক্ষায়ণী তাঁর সামনেই অতনুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার আয় কত ?

অতনু বলে, এ্যাভারেজ টু থাউজান্ডস এ মান্থ।

—তুমি ত বছরে মাত্র দুহাজার টাকার ইনকাম ট্যাক্স দাও।

অতনু মুখখানা হাঁড়ির মত করে বসে থাকে।

দাক্ষায়ণী ঠিক এর পরেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবা দেউলে হয়েছিলেন না ?

দাক্ষায়ণী দেবী তার আয়ের কথা অবিশ্বাস করাতেই অতনু বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিল, এবার ধৈর্য্য হারিয়ে সে বলে, এটা ডিফেমেটরী, জানেন বাবা কোলপ্রিন্‌স্‌।

দাক্ষায়ণী আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, জানি তোমার বাবা একজন কোলপ্রিন্‌স্‌। কিন্তু তিনি যে দেউলে হয়েছিলেন তাও আমি শুনেছি।

মোস্ট ড্যামেজিং, বলে টুপিটা নিয়ে অতনু উঠে পড়ল! দেবেন বাবু স্ত্রীর ব্যবহারে লজ্জিত হয়েছিলেন, তিনি বললেন, থাক ও-সব কথা, তুমি ব'স অতনু।

তাঁর দিকে চেয়ে 'থ্যাংক্‌স' ব'লে সেই যে অতনু উঠে চলে গিয়েছিল তারপর আর এ বাড়ীমুখো হয়নি।

আজ দেবেনবাবু সাহস সঞ্চয় করে বললেন, তার না আসার ত কারণ আছে।

দাক্ষায়ণী বললেন, তার বাবা যে দেউলে ছিলেন তা আমি ভাল ভাবেই জানি। সত্যের দিকে চোখ তুলে চাওয়ার মতন যার সাহস নেই সে আবার মানুষ!

—অতনু হয়ত জানে না।

—আলবৎ জানে।

কথাটা যে বলা উচিত হয়নি দাক্ষায়ণী তা বুঝতেন না। নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে বরাবরই তিনি অন্ধ ছিলেন, অন্য কেউ ত্রুটি দেখাতে ও সাহস করত না।

প্রতিমার অনেকগুলো বিবাহ-সম্বন্ধ এই ভাবে ভেঙ্গে গেছে। দাক্ষায়ণীর মনোনীত অনেক পাত্রই শেষ পর্যন্ত তাঁব কথার ঝাঁজ সহ্য করতে না পেরে সরে পড়েছে।

অতনু হাতছাড়া হওয়ায় দেবেনবাবু অবশ্য মনে মনে খুশী হয়ে ছিলেন। তবুও বললেন, এ সম্বন্ধটাও ভেঙ্গে গেল দেখছি।

দাক্ষায়ণী কোন উত্তব করলেন না।

একটু পরে ইতস্ততঃ করতে করতে দেবেনবাবু বললেন। আমি বলছিলাম—

—কি বলছিলে?

– প্রকাশ—

—তোমার সেই স্কুল মাষ্টার?

—প্রফেসর।

—বেশ, প্রফেসব ত কি হয়েছে?

—প্রতিমার সঙ্গে—

—জামাই করতে চাও প্রকাশকে? হেঃ হেঃ—দাক্ষায়ণী বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।

—প্রকাশ ভাল ছেলে, পণ্ডিত লোক।

দাক্ষায়ণী শ্লেষের সুরে বললেন, উপরন্তু সাহিত্য রসিক, অর্থাৎ অকেজো আর কুড়ে।

দেবেনবাবুর মুখে একটা বিরক্তির ছাপ পড়ল।

দাক্ষায়ণী আবার বললেন, একটা প্রফেসর কি করে প্রতিমার খরচ চালাবে বল দেখি? আমার মেয়ে যে ষ্টাইলে মানুষ তাতে মোটর টেলিফোন না হলেত ওর চলবে না।

প্রকাশের সবই আছে। সে রায়বাহাদুর হলধর চট্টোপাধ্যায় এর একমাত্র দৌহিত্র। তাঁর বিষয় আশয় সবই সে পাবে।

—এই হলধরটি কে?

—রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর। কলকাতায় পাঁচ পাঁচখানা বাড়ির মালিক—তা ছাড়া প্রকাশ পৈত্রিক সম্পত্তিও পেয়েছে প্রচুর।

দাক্ষায়ণী এবার একটু নরম সুরে বললেন, তা হলে বিলাত যায়নি কেন?

দেবেনবাবু এ প্রশ্নের ঠিক জবাব দিতে পারলেন না। তবে অনুমান করে বললেন, প্রকাশ ছেলে বেলায় পিতৃমাতৃ হীন। মানুষ হয়েছে দাদুর কাছে। তাই বোধ করি তিনি চোখের আড়াল করতে চাননি।

প্রকাশের অবস্থা ভাল বটে কিন্তু দাক্ষায়ণী যা চান তা কখনও তাকে দিয়ে পুরণ হবে না। তিনি চান এমন জামাই যার এক সময় হাইকোর্টের জজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বামীকে দিয়ে যে উচ্চ অভিলাষ পুরণ হয়নি ভাবী জামাতার মধ্যে তার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারতেন।

আরও একটা বাধা ছিল, তার গুরুত্বও দাক্ষায়ণীর চোখে কম

নয়। তিনি বললেন, এমন টিকিধারীকে জামাই করার কথা আমি ভাবতেও পারি না।

প্রকাশকে স্নেহ করলেও তাঁর টিকিটা দেবেন বাবুর অপছন্দ ছিল। তবে তিনি মনে করতেন তার ঐ একমাত্র ত্রুটি অসংখ্যগুণে ঢাকা পড়েছে।

তিনি কি যেন বলতে যাবেন এমন সময় একটি চাকর একখানা কার্ড নিয়ে ঘরে ঢুকল। চাকরের হাত থেকে কার্ড খানা নিয়ে দাক্ষায়ণী পড়তে লাগলেন।

তরুণ চৌধুরী—

গবেষক, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সম্পাদক জ্বলদর্চ্চি; ইত্যাদি—

পড়া শেষ হলে বললেন, কাজের লোক বটে। রাত নটাব পর এসেছেন দেখা করতে এর আগে সময় পান নি।

দেবেনবাবু বললেন, আমিত ওঁকে চিনি না।

দাক্ষায়ণী বললেন, তবে বোধ হয় আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন। বিনয় ওকে বলে দাও আজ আমার সময় নেই।

একটানা অনেকক্ষণ লিখে দেবেনবাবু শ্রান্ত হয়েছিলেন ক্ষিদেও পেয়েছিল। অপরিচি৲ ব্যক্তিটির আগমনে তিনিও তাই বিশেষ আনন্দ লাভ করেন নি। তবে একজন সাহিত্যিক এই ভাবে ফিরে যাবেন ভেবে তাঁর সাহিত্যানুরাগী মনে বেশ খারাপ লাগল। তিনি বললেন, অন্ততঃ দশ মিনিটের জন্যও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা উচিত।

—যত সব অকেজোর আড্ডা। যাক্ দশ মিনিট পরেই আমি খাবার দিতে বলব—বলে দাক্ষায়ণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দেবেন বাবু একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন।

সাহিত্যিক মাত্রই তাঁর নিকট সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। তরুণের ভাগ্যে তা জুটলনা।

তরুণ ঘরে ঢুকলে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, নমস্কার, বসুন।

তরুণ বলল, নমস্কার, আপনার সঙ্গে আমার পবিত্র সম্পর্ক, যাকে বলে হোলি ব্রাদারহুড্।

দেবেনবাবু বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকালেন।

তরুণ বলল, সাহিত্যিক ব্রাদারহুডের কথা বলছিলাম।

—ওঃ!

তরুণ বলল, আপনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

দেবেনবাবু মনে মনে খুশী হয়ে বললেন, খ্যাতি আর কোথায়?

—গোলাপ তার গন্ধের খবর রাখে না।

পর্দ্দার আড়াল থেকে হাসি চাপতে গিয়ে দাক্ষায়ণী কাসতে আরম্ভ করলেন।

দেবেনবাবু স্মিতমুখে বললেন, আপনার পরিচয়?

—আমি গবেষক।

—কার্ডেই দেখেছি।

—প্রত্নতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক—

কার্ডে তরুণের এইসব গুণাবলীর উল্লেখ থাকলেও স্বয়ং এই গুণরাশির অধিকারীর মুখ থেকে ঐ বিশেষণগুলো শুনে দেবেনবাবুর তার প্রতি একটু শ্রদ্ধা হ'ল।

তরুণ তা লক্ষ্য করে বলল, সাহিত্য-রসিক সমাজে সকলেই আমায় চেনেন।

দেবেনবাবুর শ্রদ্ধা আরও বাড়ল।

—কবিগুরু, বীরবল এঁরা আমায় স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন আমার শরৎ-দা, আর তার ভেলু কুকুর—যাক্ সে কথা। আমি এসেছি আপনার পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করতে।

কবিগুরুর স্নেহাধিকারী, শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ তুল্য একজন রসিক সুজন সাহিত্যিক হিসাবে এতরাত্রে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছেন দেখে দেবেনবাবু অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন।

গাম্ভীর্য্যের বাঁধ এবার ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, একটু চা এনে দিক্।

—না, আমি আজকাল ক্রুসেন্ সল্ট ও ভাস্কর লবণ খাই।

দেবেনবাবু বললেন, বড় দুঃখের কথা তো।

—হ্যাঁ, সাহিত্যের শাস্তি—সাহিত্যিক মাত্রেই হয় হবে দরিদ্র না হয় পেটুক, নতুবা অজীর্ণের রোগী।

দেবেনবাবু বললেন, আপনার অসীম অনুগ্রহ যে অসুস্থ শরীরেও আপনি আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

—কিছুমাত্র নয়, এই নিন্ বলে তরুণ তাঁকে একটি চুরুট দিল।

দেবেনবাবু বললেন, অফার করা উচিত ছিল আমার—

তরুণ বলল, সাহিত্যের পবিত্র বন্ধন যেখানে, সেখানে সৌজন্যের পর্দা দিয়ে সৌভ্রাত্রকে আড়াল করা উচিত নয়।

দেবেনবাবু বললেন, তাব'টে।

তিনি চুরুট ধরাতে আরম্ভ করলে তরুণ বলল, আপনার লেখাগুলো হিষ্ট্রো-সাইকো—এনালিটিক্যাল এক একখানা ডকুমেণ্ট।

দেবেনবাবু প্রশ ‍ংকারীর মুখের দিকে চোখ তুলে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নাক দিয়ে খানিকটা বাতাস বের হয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল।

তিনি বললেন, আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি একাধারে চিন্তাশীল ও কবি।

তরুণ উত্তর করল, আপনি 'জিনিয়াস্' কিনা, ধরেছেন ঠিকই।

—না, না আমি ঠিক জিনিয়স্- ‍'লে দেবেনবাবু একটু হাসলেন।

—জিনিয়াস্ তাই ধরেছেন যে আমি কবি—সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলদর্চ্চি সম্পাদক মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, শুনুন আমার একটা কবিতা,—

"মুড়ি"

মুড়ি চিঁড়ে মুড়কি আমার
তোমরা বেঁচে থাকো
(তাহলে) গরীব দেশের লোক আমাদের
বাঁচবে লাখো লাখো ॥

দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপি কবিতাটি পড়া শেষ হলে তরুণ বলল, এটা আমার রিয়ালিস্টিক কবিতা। দেশের মাটির সঙ্গে, দরিদ্র জনগণের সঙ্গে এর যোগ সুনিবিড়! কবিতাটা আধুনিক কবিতার মতো দুর্বোধ্যও নয়!

দেবেনবাবু বললেন, সত্যই কবিতাটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

হঠাৎ এই সময় পর্দ্দার ওধার থেকে দশ মিনিট শেষ হওয়ার বিজ্ঞপ্তিজ্ঞাপক কাসি শুনে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

তরুণ বলল, যাক ও কথা। আপনার লেখার আমি একজন ভক্ত।

—আমার কি কি রচনা পড়েছেন?

অন্য কেউ হলে হয়ত একটু অসুবিধায় পড়ত। কিন্তু দেবেনবাবুর লেখার সঙ্গে পবিচয় না থাকলেও তরুণ সপ্রতিভভাবে বলল, আপনার চিন্তাধারা আমার মনের তারে ঝঙ্কার তোলে!

দেবেনবাবু বললেন, আপনি কবি, কবিজনোচিত ভাষায় যা বললেন, আমার ভাব গাম্ভীর্য যুক্ত লেখার কেউ ওভাবে সুখ্যাতি করেন নি। কিন্তু এমনি প্রশংসা করেছেন অনেকে, ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট এম-এ-রা পর্যন্ত, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তাগণ।

তরুণ বলল, করবেনই ত। রামেন্দ্রসুন্দর এবং মোহিতলাল ভিন্ন এমন সারগর্ভ সন্দর্ভ বাঙলায় আর কেউ লেখেন নি!

দেবেনবাবু বললেন, রামেন্দ্রসুন্দর এবং মোহিতলালের আমি একজন ভক্ত।

—হবেনই—সোল-এর এত য়্যাফিনিটি যাঁদের সঙ্গে মানুষ

স্বভাবতঃই তাঁদের শ্রদ্ধা করে। তাঁদের ও আপনার লেখার খুব সাদৃশ্য আছে।

—দেবেনবাবু উল্লসিতভাবে বললেন, আছে সাদৃশ্য ?

—এক-শ, বার আছে। কেউ বলুক যে নেই, আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

দেবেনবাবুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তরুণ বলল, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে বলে 'অথরিটি'।

—ঐটিই আমার গবেষণার বিষয়।

—আপনার নিশ্চয়ই অনেক পুঁথি ও প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ আছে ?

—সামান্য করেছি বটে !

তরুণ বলল, সংগ্রহ আমারও আছে।

—বড় আনন্দের বিষয়, যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

—সে কি কথা ? আপনার যোগ্য হব আমি ?

দেবেনবাবু বললেন, আপনি অযথা বিনয় করছেন।

—বিনয় নয় তবে নিজে গুণী না হলেও আমি একজন মহা গুণবাণের বংশধর।

—কার ?

—বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম সূর্য্য হংসেশ্বর আমার পূর্ব্বপুরুষ। আমি তাঁর অকৃতী প্রপৌত্র।

—আপনি হংসেশ্বরের প্রপৌত্র ? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাঙালীমাত্রেই গর্ব্ববোধ করবেন।

তরুণ একটু হাসল।

দেবেনবাবু বললেন, আপনি হংসেশ্বরের উপযুক্ত বংশধর।

—নিতান্ত অযোগ্য। তিনি ছিলেন পণ্ডিতকুলচূড়া, বেদবেদান্ত

প্রভৃতি শাস্ত্রপারগ! তেলেগু পণ্ডিত দুর্দ্দান্ত ভেঙ্কটাপ্পা তাঁর কাছে শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হয়েছিলেন।

দেবেনবাবু বললেন, তাঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

—বীরবল বলতেন, হংসেশ্বরের বংশধর হয়ে তুমি কিছুই করলে না। তোমার প্রতিভা ছিল।

দেবেনবাবু বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

—আমার প্রতিভার বিকাশ হয়েছে হংসেশ্বরের বই পড়ে। আমি তাঁর জমিদারির অংশ ছেড়ে দিয়ে পুঁথিগুলি নিয়েছি।

—খুব ভাল করেছেন। আপনার কাছে তাঁর পুঁথি আছে?

—তাঁর ত' আছেই, আরও অনেক প্রাচীন লেখকের পাণ্ডুলিপি আমি সংগ্রহ করেছি।

—কি কি বই আছে?

—সাহিত্য পরিষদে দুখানা উপহার দিয়েছি। অভাবের তাড়নায় কতগুলি বেচতে হয়েছে

—তবু?

—এখনও আছে 'রসপ্রদীপ', 'ত্রৈলোক্য তারিণীর সংসার', 'হ য ব র ল' প্রভৃতি।

—দেবেনবাবু বললেন, কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি যদি দেখতে দেন।

—সানন্দে।

—সুবিধে হলে দু'একখানা কিনতে পারি!

—অনেকেই কিনেছেন, যেমন ধরুন রায় বাহাদুর হলধর চাটুজ্যে।

মুহূর্তেই দেবেনবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হলধর চাটুজ্যে, তাঁকে চেনেন আপনি?

তরুণ বলল, কিছু কিছু পরিচয় আছে।

—আপনি তাঁকে বই দেন, হংসেশ্বরের বই ?

—হ্যাঁ।

—আজ রাত হয়ে গেছে।

তরুণ বলল, বেশ আরেকদিন আসব। বই নিয়ে।

—না, না কষ্ট করে আসবেন না। দরকার হলে আমিই জানাব।

তরুণ বেরিয়ে গেল। দেবেনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

॥ ১৮ ॥

—না, না, এ ব্যাপার নিয়ে মামলা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

উদয়রাম বলল, তিনি তো করবেন বলেই স্থির করেছেন।

দাক্ষায়ণী বললেন, তাহলে মাথায় একটু ছিটু আছে, বল ?

উদয়রাম বলল, ভারী জেদী মানুষ। তার উপরে হাকিমী করেছেন অনেকদিন। কথায় কথায় বলেন, পুলিশে খবর দাও, মামলা কর।

দাক্ষায়ণীর মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়ল। তিনি বললেন, কি করা যায়, বলত ?

উদয়রাম কোনো উত্তর করল না।

দাক্ষায়ণী বললেন, পুলিশ এসে বাড়ী সার্চ করবে, সব জিনিস তছনছ ক'রে ফেলবে !

—খানাতল্লাসীর সময় ওরা কোনো শিষ্টতার ধার ধারে না।

দাক্ষায়ণী বললেন. কাগজে বেরোবে !

—সম্ভব।

—সম্ভব কি বলছ, নিশ্চয় বেরোবে—! জমিদার তরণতারণ রায়, যাঁর নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত, তাঁর মেয়ের বাড়ীতে পুলিশ সার্চ করবে—বই চোর ব'লে তাঁর জামাইকে ধ'রে নিয়ে যাবে—এ অসহ্য ! ব'লে দাক্ষায়ণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

উদয়রাম বলল, তা বটে !

দাক্ষায়ণী বললেন, হাজারো লোক পড়বে।

উদয়রাম বলল, কোনো কোনো কাগজ শুনেচি লাখ-লাখ লোক পড়ে।

—আমার বন্ধুরা হাসবে!

—না, সামনে কেউ সাহস করবে না।

—আড়ালে হাসবে তো! তাছাড়া, আমাদের প্রজারা, কারখানার কর্মচারীরা, কুলি-কামিনরা কি ভাববে বল দেখি?

উদয়রামও দাক্ষায়ণীর সঙ্গে সঙ্গে যেন হতাশ হ'য়ে পড়ল এবং ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আকাশের দিকে।

দাক্ষায়ণী একটু পরে বললেন, আমার জীবনটা হচ্ছে দুঃখের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস।

উদয়রাম নীরব।

—কত আশা ছিল, কত আকাঙ্খা—আর আজ কি না—যাক, কোন উপায় কি নেই যাতে তোমার গদাধর চন্দর মামলা না করেন?

—আছে একটা উপায়।

—কি উপায়?

—কিন্তু—

—ব'লে ফেল।

—প্রকাশের সঙ্গে প্রতিমার—

—বল কি? তরণতারণ রায়ের নাতনীর বিয়ে প্রকাশ মাষ্টারের সঙ্গে?

উদয়রাম বলল, খুবই দুঃখের কথা সন্দেহ নেই; গোলযোগটা কিন্তু মেটাবার পথ শুধু ঐ একটি!

—আমি চেয়েছিলাম বিলেত-ফেরত জামাই, আর দেখছ আমার অদৃষ্ট? কে আমার এ অবস্থা করলে, বল দেখি? চুপ করে রইলে যে? করেছে ঐ সাহিত্য!

উদয়রামের আশঙ্কা ছিল যে, স্বামী-স্ত্রীতে পুঁথি চুরির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'লে, দেবেনবাবু হয়ত স্ত্রীর কাছে তার নাম করবেন। তিনি নিজে তাকে ক্ষমা করেছেন, আশা করা যায় রায় বাহাদুরও করবেন। কিন্তু এঁদের সকলের চেয়ে দাক্ষায়ণীকেই সে বেশী ভয় করত। এখন দেখল, দেবেনবাবু স্ত্রীর কাছে তার নাম করেন নি। সে বলল, হ্যাঁ, সাহিত্যই দায়ী! কিন্তু জামাই বাবুকে কিছু বলবেন না যেন।

—কেন বলব না, শুনি!

--তিনি এমনিই যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছেন।

—লজ্জা—হেঃ, হেঃ!

—বললে তিনি হয়ত—

—হয়ত কি?

—অত্যন্ত মনোকষ্ট পাবেন।

—পাওয়া তাঁর উচিত!

- তিনি বলেছেন, "বড্ড ঝামেলায় পড়েছি, উদয়! উনি যদি কিছু বলেন, তা'হলে আর এ জীবন রাখব না!" বলেছেন অবশ্য গোপনে।

—বলছ কি! জীবন রাখব না মানে?

—আমায় যা বলেছেন, তাই আপনাকে জানালাম॥

—অসম্ভব! এই সামান্য কারণে কেউ জীবন মরণের প্রশ্ন তোলে না। আমার মনে হয়, লিখে লিখে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

উদয়রাম চুপ ক'রে রইল।

এই সব অপ্রীতিকর ব্যাপারের জন্য স্বামীকে ভর্ৎসনা ক'রে মনের বেদনা একটু লাঘব করবারও উপায় রইল না দাক্ষায়ণীর। তিনি বললেন, মামলা হ'লে উনি হয়ত মুষড়ে পড়বেন।

—নিশ্চয়ই পড়বেন!

দাক্ষায়ণী একটুক্ষণ কি যেন ভেবে বললেন, আচ্ছা, প্রকাশের অবস্থা কেমন ?

—ভাল !

—কি রকম ভাল ?

—নিজের ভাগে কলকাতায় তার অনেকগুলো বাড়ী আছে, মাতামহেরও পাবে পাঁচ-পাঁচখানা বাড়ী। তার একখানা আবার ডালহৌসী স্কোয়ারে। ব্যাঙ্কেও প্রচুর টাকা আছে।

—প্রতিমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে ওকে কি বিলেত পাঠান যাবে ?

—আপনার জামাই হ'লে, আপনার কথা নিশ্চয়ই মান্য করবে !

—দেখলে ওঁর ব্যাপার ? প্রকাশ দস্তুর মত বড়লোক ! অবস্থা ভাল, পড়াশুনোয় ভাল, চেহারাও সুন্দর অথচ—

একটু থেমে দাক্ষায়ণী আবার বললেন, তবে একটা ভাবনার কথা, ছেলেটি সাহিত্য করে।

—ওটা আপনার ভুল ধারণা।

দাক্ষায়ণীর মাথার উপর থেকে যেন বড় একটা বোঝা নেমে গেল। তিনি বললেন, ওঃ, সাহিত্য করে না ? তাহলে অতক্ষণ একটানা ওঁর লেখা শোনে কি করে ?

প্রেমাস্পদার পিতার লেখা শোনা অপেক্ষাও অনেক কষ্টসাধ্য কাজ প্রেমিক খুব আনন্দের সহিতই করতে পারে। এই সহজ সত্যটা দাক্ষায়ণী ও উদয়রাম উভয়েই উপলব্ধি করছিলেন, কিন্তু তাঁদের যে সম্পর্ক তাতে এর আলোচনা করা চলে না।

দাক্ষায়ণী বললেন, আচ্ছা, তোমার হলধরবাবুকে ব'ল যে, তাঁর নাতির সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে দিতে রাজী আছি। অবশ্য যদি তিনি মামলা না করেন— !

উদয়রাম বলল, সে তো ঠিকই !

—এই সর্তে রাজী, বুঝলে তো ?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, ভাল কথা। ওর টিকিটা সম্বন্ধে—টিকিধারী জামাই—আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ভাববে কি!

—তার জন্যে আটকাবে না!

—তাহলে, তুমি আমার নাম ক'রে রায়বাহাদুরকে ব'ল।

সব রকমে সফলকাম হ'য়ে উদয়রাম হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরল। এবং ফিরেই বড় এক পেগ হুইস্কি দিয়ে প্রকাশ ও প্রতিমার স্বাস্থ্য পান করল।

॥ ১৯ ॥

কেউ হাঁ করে ঘুমোয়, ঘুমন্ত অবস্থায় কারও চোখ থাকে আধ-বোজা, কেউ হাত দুখানা বিপরীত দিকে ছড়িয়ে রাখে। কেউ নাক ডাকায়; কেউ বা ঘুমের মধ্যে কথা বলে। মোটের উপর মানুষের এই সময়ের বিচিত্রভঙ্গীর তালিকা লিখে শেষ করা যায় না।

ঘুমের সময় নিজের চেহারা দেখলে রায় রাহাদুর, খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর [illegible]বেরা ত' দূরের কথা সাধারণ লোকেও নিরতিশয় লজ্জাবোধ করবে।

উচ্চপদ, দীর্ঘপদবী, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং প্রগাঢ়তর সাহিত্য-প্রীতি থাকা সত্ত্বেও হলধরবাবুর ঘুমের সময়কার অবস্থা ছিল প্রকাণ্ড হাস্যোদ্দীপক।

চোখ বোজার একটু পরেই তাঁর মাথা বালিশ থেকে পড়ে যায়। একখানা হাত খাটের বাইরে ঝুলতে থাকে—মাথা পূর্ব থেকে উত্তর, উত্তর থেকে পশ্চিমে ঘুরে যায়। তিনি ঘুমোন হাঁ করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মুখের এই গহ্বরটি ক্রমেই বাড়ছে।

রায়বাহাদুর সেদিন রাত্রে এইভাবে ঘুমোচ্ছিলেন। এক একবার মুখের ওপর মাছি পড়ে, ঘুমন্ত অবস্থায় হাত দিয়ে মাছি তাড়ান।

মাছি বিতাড়নের এইরূপ এক মুহূর্ত্তে তাঁর মনে হ'ল কে যেন গলায় হাত দিয়েছে।

অলরট্ বলে নিজের গলায়ই তিনি একটা চড় মারলেন, তারপর চোখ খুলে কিছু দেখতে না পেয়ে আবার পাশ ফিরে শুলেন।

খানিকটা পরেই কণ্ঠদেশে আবার সেই স্পর্শ।

হলধর ভাবলেন অলরট বলে জিনিষটাকে তো আর উপেক্ষা করা চলে না। সত্যই এবার কে যেন গলায় হাত দিয়েছিল, শুধু হাতই দেয় নি, বোধহয় একটু জোরে টিপে ধরেছিল।

'চোর' 'চোর' বলে চেঁচাবার সময় নেই। ডাকার সময় আততায়ী তাঁকে সাবাড় করে ফেলবে।

বলং বলং বাহু বলং।

হলধর নিজের হাতের গুলি টিপে বাহুর বল পরীক্ষা করলেন। বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যৌবনের ব্যায়াম একেবারে বৃথা যায়নি।

পরীক্ষার জন্যই হোক বা আততায়ীকে শিক্ষা দেবার জন্যই হোক তিনি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শিয়রের দিকে একটা ঘুষি ছুঁড়লেন, ঘুষিটা গিয়ে পড়ল কাধের উপর। রায়বাহাদুর বলে উঠলেন, উঃ অলরট। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখ পড়ল আততায়ীর উপর। লোকটা একেবারে তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে।

ঘুষি বসাবার সঙ্কল্প তখন আর ছিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে একলাফে তিনি আততায়ীর গলা ধরে ঝুলে পড়লেন।

তবে রে শা—

রায়বাহাদুরের মুখের উগ্র গন্ধে লোকটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল। হলধরের মনে হল লোকটি বিপুলকায়। যাক্ একবার যখন বাগে পেয়েছেন, তখন আর বদমাসকে ছেড়ে দেবেন না।

আততায়ীর গলে এইরূপ বিলম্বিত অবস্থায় মিনিটখানেক কেটে গেল। হলধরের মনে হল ব্যাপারটা বিস্ময়কর, লোকটা মোটেই

তাকে আঘাত করার চেষ্টা করছে না, কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই সে সচেষ্ট।

কিন্তু ছাড়া হচ্ছে না, হলধর আরও জোরে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাকলেন, প্রকাশ—উট্রাম, খুন, ডাকাত!

তাঁর গলার স্বর এত নীচু হয়েছিল যে, প্রকাশ কিংবা উট্রাম ঘরের মধ্যে থাকলেও তা শুনতে পেতো কিনা সন্দেহ।

রায় বাহাদুর জোর গলায় আবার ডাকলেন, দারোয়ান, প্রকাশ, দশরথ, রাম অলরট।

—চুপ, দাদু।

—দাদু কোন শা—বিপদে পড়লে সবাই অমন দাদু ডাকে।

আততায়ী বলল, আমি প্রকাশ।

—প্রকাশ! রায়বাহাদুর আততায়ীকে ছেড়ে আলোর সুইচ টিপে দিলেন।

সত্যই-ত এ যে প্রকাশ।

—অলরট তুমি!

ইতিকর্তব্যস্থির করার জন্য শিয়রের পাশে টেবিলে রক্ষিত মদ থেকে একচুমুক গলা৷ধঃকরণ করে রায়বাহাদুর প্রকাশের আপদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন।

তারপর—বললেন, অল্ রট্, ৫ কাশ।

—দাদু।

—তুমি আমার গলা টিপে—

—দাদু।

—আমার টাকা পয়সা বাড়ী-ঘ ' ¯বইত তোমার।

প্রকাশ বলল, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর?

—এখনই তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। তুমি আমার রাণুর ছেলে, বলে হলধব সশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকাশ বলল, করছ কি, চাকর-বাকর কি ভাববে?

—তুমি আমার সেন্টিমেন্ট বোঝ না প্রকাশ।

—তুমিও আমার সেন্‌টিমেণ্ট এর খবর রাখনা।

রায় বাহাদুর দৌহিত্রের গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, কাগজ বের কর ঐ ড্রয়ার থেকে। এখনই তোমার নামে সব লিখে দিচ্ছি।

—কাল যা হয় করো।

—অলরট, তোমার হাতে ওটা কি ?

—মাতুলী।

—গভীর রাত্রে মাতুলী, ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—সোনার মাতুলী।

—কি হবে মাতুলী দিয়ে।

—তোমার গলায় পরাবার জন্য—

—আমার গলায় ?

—আই য়্যাম ইন লাভ।

—সে তো জানি। তার সঙ্গে আমার গলার সম্বন্ধ—?

—আছে—তোমাকে মাতুলী পরালে—।

—তুমি প্রেমে জয়ী হবে ? হেঃ হেঃ, অলরট্, হেঃ, অলরট।

—ঠিক বলেছ।

—রাত্রে আরব্য উপন্যাস পড়েছ বুঝি, কিন্তু আমি ত তোমার প্রতিদ্বন্দী হব না।

প্রকাশ বলল, জ্যোতিষী বলেছেন—

—জ্যোতিষী! এই সব করেই তোমার টাকা পয়সাগুলো যাচ্ছে বুঝি ?

—রামবাঞ্ছা ভৃগুলাঞ্ছন বলেন—

—কাল সকালেই তাকে জেলে পাঠাব।

—এটা মন্ত্রঃপুত।

—তুমিও একটা মন্ত্রঃপুত পুতুল। এসব শুনলে প্রতিমা কি ভাববে বলো দেখি ?

প্রকাশ বলল, প্রতিমা দেবেনবাবুর মেয়ে।

—সে ত জানি।

—তিনিই ঘটকর্পর।

—ঘটকর্পর ও দেবেন এক লোক! দেবেনই তাহলে সাহিত্য—তস্কর?

—তিনি ভদ্রলোক।

—বই চুরি করে হলেন ভদ্রলোক। তোমার ভদ্রতার ডেফিনেশন ভাল।

—তিনি চুরি করেন নি, দাছু।

—তুমি আমায় এতদিন গোপন করেছ যে ঘটকর্পর আর দেবেন—

—সাহস হয়নি। এই মাছুলীর ব্যবস্থা করেছি সেইজন্য যাতে তোমার মত হয়।

—প্রতিমা দেবেনবাবুর মেয়ে। এই প্রতিমাই সিনেমার সেই সুন্দরী—?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ঘটকর্পব' বলে, রায় বাহাছুর পদচারণা আরম্ভ করলেন।

একটু পরে বললেন, আমিও প্রেমে পড়েছিলাম প্রকাশ—তোমার দিদিমার সঙ্গে।

তাঁকে না পেলে কি হত জান। হয়তো একটা রটন উকীল নয়ত গভর্ণমেণ্ট অফিসের লোয়ার গ্রেডের কেরানী। আজ আর আমি—

আবার পদচারণা আরম্ভ হল, ছবার রায়বাহাছুর বললেন, কিন্তু ঘটকর্পর।

প্রকাশ মাতামহর দিকে চেয়ে রইল।

এইভাবে কিছুসময় কেটে গেল, হঠাৎ একবার থেমে রায়

বাহাত্বর জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রতিমাকে না পেলে তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, কি বল ?

—নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, তোমার দিদিমাকে না পেলে আমারও হ'ত। যদি তাকে পাও ?

প্রকাশের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, পেলে জীবনে খুব উন্নতি করতে পারব।

—বেশ, আমি মত দিলাম।

—দাত্থ, তুমি সত্যি মহৎ।

—কাব্য ছেড়ে দাও। এই মাত্থলী পরানোটা ঘটকর্পর শিখিয়ে দেয় নিতো।

—তিনি ভদ্রলোক।

—তাহলে তুমি স্বীকার করছ যে মাত্থলী পরানোটা ভদ্রোচিত নয় ?

—এর মধ্যে তিনি থাকলে একটু দৃষ্টিকটু হতো বৈকি।

—তিনি নেই। তা হলে তো দেখছি লোকটা একেবারে বাজে নয়।

—তিনি তোমারই মত ভদ্র, উদার ও মহৎ।

—চল, কালই প্রতিমাকে আশীর্বাদ করে আসি।

—তার বাপ মার মত হোক

—অল্‌রট্‌। তাদের আবার মতামত কি! আমার নাতি তুমি, ইউনিভার্সিটির জুয়েল, তোমাকে মেয়ে দিতে আপত্তি ?

—তার মার হয়ত আপত্তি আছে।

—তার বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই ? কি ধৃষ্টতা, চল কালই তাদের বাড়ীতে।

—সে পরে হবে।

—শুভস্য শীঘ্রং, চেক্ দিয়ে প্রতিমাকে কালই আশীর্ব্বাদ করব।

—চেক্ কেন ? তোমার পায়ের ধুলোই যথেষ্ট।

—ধুলো হচ্ছে য়্যায়ারী নাথিং। চেকে তোমার মত না হলে গয়নার নাম কর। আউট্ উইথ ইট্।

বাইরে তখন রাত্রির অন্ধকার কেটে যাচ্ছিল।

২০

বেলা ন'টা। জানালা দিয়ে একরাশ সোনালী আলো এসে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে প্রকৃতির উজ্জ্বল রূপ দেখলে মন আনন্দে ভরে যায়।

ঘরের মধ্যে বসে দেবেনবাবু সানন্দে শশা খাচ্ছেন আর ভাবছেন একটা গভীর সাহিত্যিক তথ্যের কথা।

এই সময় দরজার পাশ থেকে প্রকাশ বলল, দাদু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

স্প্রিং এর দরজা ঠেলে প্রকাশ ঘরে ঢুকল, তার পিছনে গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি এক বৃদ্ধ, সর্বপশ্চাৎ উদয়রাম।

দেবেনবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, নমস্কাব, বসুন !

হলধর বললেন, অলরট্, আপনাকে বিরক্ত করলাম ক্ষমা করবেন।

তারপর আসন গ্রহণ করে মাবার বললেন, আপনি একজন গবেষক, পণ্ডিত লোক।

দেবেনবাবু নীচের ঠোঁট আঙুল দিয়ে নাড়তে লাগলেন।

সদা-সহৃদয়, সাহিত্যে পবম উৎসাহী দেবেনবাবুর এই গাম্ভীর্য্যে প্রকাশ দমে গেল। উদয়রামও ভাবল, ব্যাপার কি ?

হলধর বললেন, আমাব নাতি শ্রীমান প্রকাশ আপনার বিশেষ স্নেহভাজন।

দেবেনবাবু বললেন, হুঁ আপনি কি চা খান ?

তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

দেবেনবাবু ভাবলেন, ভদ্রলোক বলে কি?

রায় বাহাদুর বললেন, বিস্মিত হচ্ছেন বুঝি? আপনি একজন গবেষক। দেখুন দেখি গবেষণা করে।

—এ আমার শক্তির অতীত।

—ফোন্ করেই আসছি, মিসেস্ চক্রবর্ত্তী চা পাঠিয়ে দিলেন ব'লে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। হলধর আসছেন ফোন করে এবং দাক্ষায়ণী তার জন্য চা তৈরী করে পাঠাচ্ছেন!

হলধর বললেন, আগেই আপনার নাম শুনেছি। আজ আলাপে বড় আনন্দিত হ'লাম।

দেবেনবাবু বললেন, সাহিত্যিক হিসেবে আপনার—

—অল্ রট্। সাহিত্য পরশু থেকে ছেড়ে দিয়েছি।

এই সময় চা এল, সঙ্গে রেকাবভর্ত্তি খাবার এবং পিছনে স্বয়ং দাক্ষায়ণী। তাঁকে দেখে হলধর, প্রকাশ, উদয়রাম তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন।

দাক্ষায়ণী সহাস্যমুখে হলধরকে বললেন, বসুন রায় বাহাদুর। আপনি পায়ের ধুলো দেওয়ায় আমরা কৃতার্থ হয়েছি।

হলধর বললেন, আমিও নিজেকে আজ ধন্য মনে করছি।

দেবেনবাবুর মনে হ'ল, ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের উপর একখানি নাটক অভিনীত হচ্ছে।

দাক্ষায়ণী স্বামীকে বললেন, রায়বাহাদুর খুব সদাশয় লোক, জান বোধহয়?

দেবেনবাবু নিরুত্তর।

রায়বাহাদুরকে বললেন, চা খান, রায় বাহাদুর। প্রকাশ, ডিস্‌টা এগিয়ে নাও, তুমি বসে রইলে যে। উদয়রাম আরম্ভ কর।

হলধর বললেন, নিশ্চয়ই খাব। এর পর তো ঘন ঘন খেতে হবে।

দেবেনবাবু এবার মাথা চুল্‌কোতে আরম্ভ করলেন।

একখানা সিঙারা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হলধর বললেন, আপনার স্ত্রীর মত হয়েছে। এখন আপনার সম্মতি পেলেই—

দেবেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সম্মতি কিসের ?

হলধর বললেন, শ্রীমান প্রকাশের সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমার বিবাহ।

দেবেনবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মত দিয়েছে ?

—হ্যাঁ, ফোনেই জানিয়েছি।

—আমার মত নেই।

দাক্ষায়ণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি বললেন, দেখলেন ওঁর কাণ্ডটা ? এর আগে অন্ততঃ দশ দিন বলেছেন এই সম্বন্ধ করতে।

হলধর জিজ্ঞাসা করলেন, আজ অমত করছেন কেন, দেবেনবাবু ?

—মত এক সময় ছিল ঠিকই, কিন্তু আমি তা বদলেছি।

প্রকাশের মুখখানা একেবারে কালো হয়ে গেল।

দাক্ষায়ণী বললেন, প্রকাশের মতন ছেলে পাবে কোথায় ? এতদিন তো চেষ্টা করলে।

—প্রকাশ ছেলে ·াল। কিন্তু—

হলধর বললেন, কিন্তু কি ?

—আপনি আমার বিরুদ্ধে গুপ্তচর লাগিয়েছেন, মাত্র দু'দিন আগে—

—গুপ্তচর, অল্ রট্। কে লাগিয়েছে ?

—আপনি—

—আমি !

—আপনার ধারণা আমি আপনার পুঁথি জেনে শুনে সরিয়েছি। আমি প্রকাশের মারফৎ ক্ষমা প্রার্থনা করায়ও আপনি খুশী হননি। আমার স্ত্রী এসব জানে না।

দাক্ষায়ণী বললেন, সবই জানি।

—তুমি কি করে জানলে ?

—সে কথার এখন দরকার নেই।

দেবেনবাবু হলধরকে বললেন, প্রকাশের সঙ্গে আমার সম্প্রীতির কথা জেনে পূর্বেই আপনার ক্ষমা করা উচিত ছিল।

—তা একশ'বার বলতে পারেন। আমি সেজন্য লজ্জিত।

—তাহলে আবার আমাকে পরীক্ষার জন্য জ্বলদর্চ্চি সম্পাদককে পাঠালেন কেন ?

—কে, তরুণ চৌধুরী ?

— হ্যাঁ, সাহিত্যিক, গবেষক।

—এবং একটি রাস্কেল, সে এসেছিল এখানে ? হলধর বললেন।

—আপনি তাহলে কিছুই জানেন না ?

—রট্‌ন মোষ্ট ; নেভার।

দেবেনবাবু বললেন, সে এসেছিল বই বেচতে।

হলধর জিজ্ঞাসা করলেন, পুরোণো পুঁথি ?

—হ্যাঁ।

—ঐ ওর ব্যবসা। তুলোট কাগজে কিংবা তালপাতার উপর সেকেলে ধাঁজে বই লিখে প্রচীন সাহিত্য বলে চালায়। আমাকে ঐভাবে ঠকিয়েছে অন্ততঃ দু'হাজার টাকা। তার উপর গবেষক সেজে সমাজে হাস্যাস্পদ হয়েছি।

দেবেনবাবু বললেন, তা হলে লোকটা ভীষণ জোচ্চোর।

—আপনি বই কেনেন নি তো ? হংসেশ্বরের নাম করে তরুণ লোকদের ঠকায়।

দেবেনবাবু বললেন, না, কিনিনি। আমায় মাফ করবেন রায়বাহাদুর। আমি ভুল বুঝে আপনার মত মহাশয় লোকের প্রতি অবিচার করেছি।

আনন্দে প্রকাশের বুকখানা ধুক্ ধুক্ করতে লাগল।

হলধর বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করে সাহিত্য চর্চা ছেড়ে